সাহিত্যিকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ও

সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

ব্যানার্জ্জী ব্রাদ্রার্স
১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীউমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৩৪৮
দাম দেড় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীমতীন্দ্রনাথ সিংহ
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা

সূচী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ **শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর** মহাশয়ের করকমলে—

ভূমিকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লোকান্তর প্রাপ্তির পরই তাঁর জীবন ও সাহিত্যের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা হতে পাবে না। তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর প্রতিভা ও কীর্ত্তির বিচার করা, যাঁরা তাঁর খুব কাছাকাছি ছিলেন, তাঁদের পক্ষে কঠিন। তাঁর পূর্ণ আশী বৎসর ব্যাপী জীবনের সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখাও তাঁর বহু পরে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের পক্ষে আপাততঃ অসম্ভব। তবু কবির জীবৎকাল থেকেই তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে দেশে-বিদেশে আলোচনা সুরু হয়েছে, তার কারণ ভাবী কালের ঐতিহাসিক বা সমালোচকের ওপর ষোল-আনা বরাত দিয়ে রেখেই সমসাময়িকেরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাঁদের সকলের আলোচনা থেকে নিষ্কর্ষ আহরণ করে এবং তারি সঙ্গে কিছুটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মিশাল দিয়ে এই বই লেখা হল।

এতে মহামানব রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম্মের, মনন ও সৃষ্টির মোটামুটি তথ্য সবই সংক্ষেপে উপস্থিত করা হয়েছে, এবং আলোচনায় যতদূর সম্ভব বিভিন্ন 'স্কুলে'র মতামত নিয়ে যাচাই করেও দেখানো হয়েছে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে এখনো দীর্ঘ দিন খণ্ড-আলোচনা চলবে এবং সেই সমস্ত আলোচনা দেশের জন-মনে পরিব্যপ্ত হয়ে হয়ে কালে একটা অখণ্ড রাবীন্দ্রিক আবহাওয়া তৈরী হবে। তখনি আসবে তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ও সমগ্র আলোচনার সময়। কিন্তু সেই দিনের লেখককে হাতের কাছে বাস্তব উপকরণগুলো জুগিয়ে দেবার উপযোগী বই-পত্র লিখতে

হবে সমসাময়িককেই। তাছাড়া রবীন্দ্র-শোকে অভিভূত দেশের সহস্র সহস্র নর-নারীর মনে আজ জেগেছে মহাকবি সম্বন্ধে নানা রকম জিজ্ঞাসা—তার উত্তর দেওয়াও দরকার। এই দু'দিককার কাজে আমরা আংশিক সাফল্য লাভ করে থাকলেও আমাদের প্রয়াস সার্থক মনে করবো।

এই বই রচনায় আমাদের প্রধান অবলম্বন ছিল বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'—যাতে সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে। এছাড়া Visva-bharati Quarterly: Tagore Birth-day Number ও Municipal Gazette রবীন্দ্র জন্মতিথি সংখ্যা ও মৃত্যু বিশেষ সংখ্যা থেকেও আমরা পেয়েছি প্রচুর উপকরণ। প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, প্রভৃতি পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বই থেকেও পেয়েছি যথেষ্ট সহায়তা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনী, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর প্রমুখ বিশ্ব-ভারতীর বন্ধুবর্গের এবং কবি-পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্যও আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করছি।

কলিকাতা
১৫ই অগ্রায়ণহ, ১৩৪৮

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত
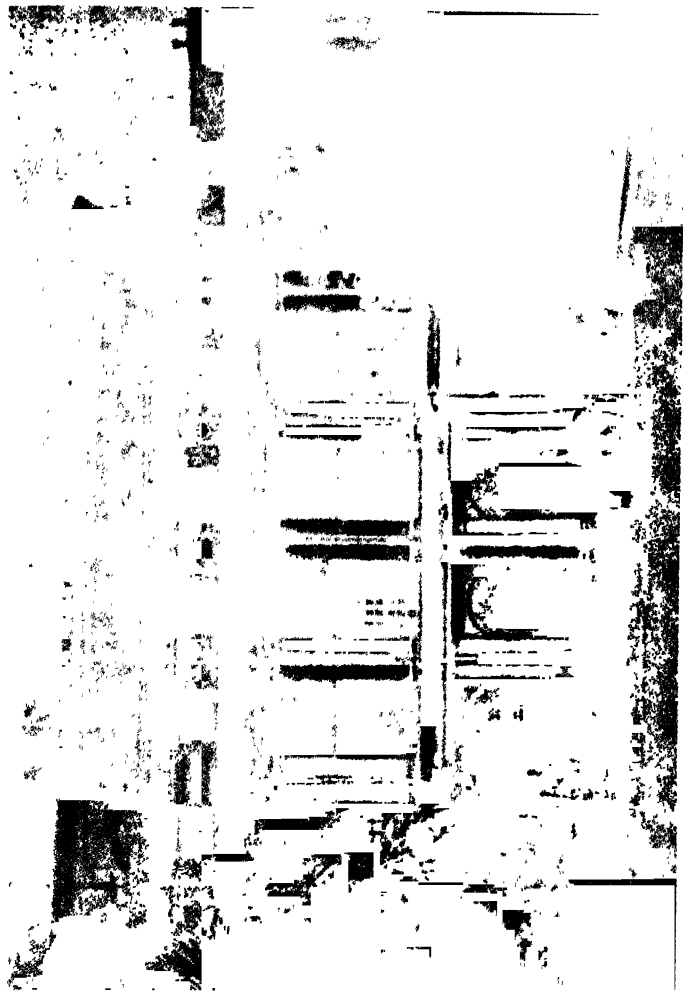
প্রথম খণ্ড : জীবন

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্মদিন
১৯৩৭

বিশ্বকবির হস্তলিপি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

কলকাতা ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পৈত্রিক ভবনে ১৮৬১ সালের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখে, ১২৬৮) মঙ্গলবার রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। মহর্ষির পনেরোটি সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্ব্ব কনিষ্ঠ—তাঁর পর আর একটি পুত্র-সন্তান হয়েছিল বটে, কিন্তু সে দীর্ঘজীবন লাভ করেনি।

মহর্ষির পিতা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের সমসাময়িক এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁরই প্রভাবে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আদিতে এঁরা ছিলেন কৃষ্ণনগরের একটি সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবার। এঁরা পিরালী ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ—পিরালা এঁদের জন্মগ্রাম। সেখান থেকে কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে দ্বারকানাথের পিতামহ কলকাতায় আসেন এবং অর্থোপার্জ্জন করে খ্যাতিমান হন। দ্বারকানাথ সেই খ্যাতিকে করেন সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্বারকানাথ তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্যের জন্যে দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এমন কি ইউরোপেও তাঁর ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি ছড়িয়েছিল। ইউরোপগামী ভারতবাসীদের

মধ্যেও তিনি রামমোহন রায়ের পরই উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে প্রিন্স বা যুবরাজ আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। লণ্ডনেই দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়।

মহর্ষি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আদি ব্রাহ্ম সমাজের স্থাপয়িতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক এবং ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট একজন সংস্কারক রূপে তিনি বাংলা দেশে বিদ্যাসাগরের মতোই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পিতা দ্বারকানাথের অতুল ঐশ্বর্য্য অপব্যয় ও অবিবেচনার ফলে শুধু ক্ষয়ই পায়নি, সমৃদ্ধ ঠাকুর পরিবার তাঁর মৃত্যুর সমকালে আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত ছিল। মহর্ষি সেই পিতৃ-ঋণের বোঝা নামালেন এবং আবার ঠাকুর পরিবারে সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এদিক থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়ে তিনি ষোল-আনা লিপ্ত ছিলেন না। অন্তরে তিনি লালন করতেন সুগভীর ঈশ্বরানুরাগ এবং সুমহান স্বদেশ প্রেম। বাইরের বহু কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকলেও, ভেতরে তাঁর এই দুটি ব্রত পালনের স্পৃহা ও আয়োজন কোন দিনই হ্রাস পায়নি। তাই পত্নী ও পুত্র-কন্যা পরিবৃত হয়ে, এমন কি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও, শুধু নামে নয়, কাজেও তিনি মহর্ষি হতে পেরেছিলেন।

বাংলা গদ্য রচনাতেও মহর্ষির বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। তাঁর 'আত্মজীবনী' শুধু তাঁর জীবন কাহিনী ও তাঁর সাধন

পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ

প্রণালীর পরিচায়ক রূপেই প্রসিদ্ধ নয়, উৎকৃষ্ট বাংলা গদ্য গ্রন্থ হিসাবেও তা বিশেষ উপভোগ্য।

পিতার এই নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁর পুত্র-কন্যাদের, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

মহর্ষির পুত্র-কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি, দার্শনিক এবং পূত চরিত্র ব্যক্তি রূপে সকলের পূজার্হ ছিলেন। তাঁর 'স্বপ্ন প্রয়াণ' কাব্য এবং 'নানা চিন্তা' প্রবন্ধ পুস্তক বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথকে মহাত্মা গান্ধী, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিরাও চরিত্র-মাধুর্য্য এবং প্রতিভা-বৈশিষ্ট্যের জন্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। দ্বিতীয় সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান হিসাবে সমধিক খ্যাত হলেও, কবি এবং মনীষী রূপেও তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' এবং মেঘদূতের পদ্যানুবাদ ও 'বুদ্ধকথা' বই সকলেই হয়ত পড়েছেন। 'বন্দে-মাতরমে'র জন্মের পূর্ব্বে 'মিলে সব ভারত সন্তান' নামক প্রসিদ্ধ স্বদেশী সঙ্গীত লিখেও তিনি দেশে সম্মানিত হন। তৃতীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনে নাট্যকার ও পরবর্ত্তী জীবনে অনুবাদক-রূপে বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'অশ্রুমতী' ও 'সরোজিনী' ঐতিহাসিক নাটক, এবং 'অলীক প্রকাশ' প্রহসন সুপ্রসিদ্ধ। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের এবং ফরাসী ছোট গল্পের অনুবাদেও তিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল ও সাধু প্রকৃতির মানুষ—দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবর্ত্তন করতে গিয়ে অনেক লোকসানও স্বীকার করেছিলেন। শেষ জীবন তিনি কাটিয়েছিলেন রাঁচিতে, নির্লিপ্ত সাহিত্য সাধনায়।

ভগিনীদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী ওসাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বিনী ছিলেন—কাব্যে ও উপন্যাসে, বিশেষ করে সম্পাদনায় তাঁর কৃতিত্ব স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। অপরাপর ভাই-বোনেদের মধ্যে কারুর সাহিত্যিক কৃতিত্ব না থাকলেও, শিল্পানুরাগ ও বিষয়-বুদ্ধিতে তাঁরাও কেউ কেউ বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক নিয়মেই ধ্যানী ও সংস্কারক পিতার এবং সাহিত্যিক ও শিল্প-রসিক ভাই-বোনেদের প্রভাবে অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য ও কলা-চর্চ্চার এবং অধ্যয়ন ও মননের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর ভ্রাতৃ-বধূদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীও ছিলেন তখনকার সমাজের হিসাবে রুচি ও সংস্কৃতির ব্যাপারে যথেষ্ট প্রগতি সম্পন্না। জানদানন্দিনী বাংলাদেশে মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের যে নূতন ফ্যাসন প্রবর্ত্তন করেছিলেন, পরবর্ত্তীকালে তাই সকলের আদর্শস্বরূপ হয়েছে। এ ছাড়া পরিবারস্থ বালক-বালিকাদের সাহিত্য সেবায় অনুপ্রাণিত করবার জন্যে তিনি 'বালক' নামে একটি পত্রিকাও বের করেছিলেন। সঙ্গীতে নিপুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পত্নী কাদম্বরী দেবীকে গান-বাজনা শিখিয়েছিলেন—ঠাকুর পরিবারে মেয়েদের

মধ্যে গানের চর্চ্চা প্রধাণতঃ এঁরই দ্বারা প্রচার পায়। স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে পথে বেরুনোতেও এঁরাই ছিলেন অগ্রণী।

অল্প বয়সে মাতৃহীন হয়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন এঁদের আবহাওয়ায়। তাই এঁদের শিল্প-রুচি, সংস্কার-বুদ্ধি এবং যুগোচিত অগ্রগামিতা স্বভাবতঃই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এমন কি অতি অল্প বয়সেই তিনি এঁদের নানামুখী আন্দোলন-আয়োজনে সহযোগিতাও করতেন।

কবিকে শিক্ষার জন্যে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি করা হয় আট বছর বয়সে। কয়েক মাস পরে সেখান থেকে তিনি যান কলকাতা নর্ম্যাল স্কুলে। তারপর আবার তাঁকে ভর্ত্তি করা হয় বেঙ্গল এ্যাকাডমিতে। কোন জায়গাতেই তিনি ভালো ছেলেটি হয়ে নিবিষ্ট মনে লেখা-পড়া করতে পারেন নি। পিতার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন যে ভাবুকতার প্রেরণা এবং দাদাদের ও ভ্রাতৃ-বধূদের প্রভাবে তাঁর মধ্যে এসেছিল যে শিল্পানুরাগ এবং সাহিত্য-প্রীতি, স্কুলের বাঁধা-বরাদ্দ পাঠ্য ও পাঠন-পদ্ধতির সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর পথে তা করলো প্রবল বাধার স্বষ্টি। তিনি স্কুল পালিয়ে বেড়াতেন এবং ঠাকুর বাড়ীর প্রকাণ্ড প্রাসাদের কোন এক কোণায় লুকিয়ে বসে হয় কবিতা লিখতেন, নয় পৃথিবীর বিচিত্র গতি লক্ষ্য করতেন।

বাড়ীতে তাঁর শিক্ষার জন্যে গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁরা আসতেন নিয়মিত সময়ে, নিয়মিত পাঠ্য পড়াতেনও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত শিক্ষা বেশীদর অগ্রসর হল না। শিক্ষার আসল যা

উদ্দেশ্য—চিন্তা ও কল্পনার বিস্তার, তা তাঁর হয়ে চললো পারিবারিক আবহাওয়া থেকেই, বরং পাঠ্য তালিকার শক্ত লাগাম মুখে না থাকায় সহজ আনন্দেই সেটা হতে লাগলো। কিন্তু যাঁর দাদারা নাম করেছিলেন এক-একটি দিগ্‌গজ পণ্ডিত রূপে, তাঁদেরই ছোট ভাইয়ের এইটুকু শিক্ষাকে কে পর্য্যাপ্ত বলে মনে করবেন? মহর্ষি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন, কখনো ডালহাউসি পাহাড়ে, কখনো অমৃতসরে তিনি ঘুরতে লাগলেন পিতার সঙ্গে সঙ্গে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ ইত্যাদিতে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে লাগলেন। অবসর সময়ে পিতার কাছ থেকে মুখে-মুখে উপনিষদের তত্ত্বগুলির সরল ব্যাখ্যাও শুনতে লাগলেন। আর শিখতে লাগলেন সকাল-বিকেল পালোয়ানের কাছে কুস্তি। এই সময়ের অভিজ্ঞতা ও ভ্রমণের বিবরণ কবির স্ব-লিখিত 'জীবন স্মৃতি' বইয়ে স্থান পেয়েছে।

কিন্তু অল্পদিন পরেই কলকাতায় ফিরে তাঁকে সেণ্টজেভিয়াস স্কুলে ভর্ত্তি হতে হল। এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে সুরু হল তাঁর সাহিত্য-সাধনা। 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে একখানি নাটক এবং সেক্সপিয়র কৃত 'ম্যাকবেথে'র বঙ্গানুবাদ তাঁর প্রথম রচনা। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপিগুলি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, আজ আর তার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ' তত্ত্ববোধিনীতে এবং 'হিন্দু মেলার উপহার' দ্বৈভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় যখন বের হয়, তখন তাঁর বয়স বছর চোদ্দ। এই সময় তাঁর জননী সারদা দেবীর মৃত্যু হয়।

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

অনেকগুলি সন্তানের জননী এবং প্রকাণ্ড সংসারের গৃহিণী হওয়ায় সারদাদেবী ভাব-প্রবণ কনিষ্ঠ পুত্রটির ওপর খুব বেশী নজর রাখতে পারেন নি—শিশু রবির তদারকের বেশীর ভাগ দায়িত্বই ন্যস্ত ছিল ভৃত্যদের হাতে। এই ভৃত্যেরা নেহাৎ ভালো-মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে ঘরে আটক করে, কি ভাবে নিজেরা আপন আপন খেয়ালে ঘুরতো, তার কৌতুকাবহ অনেক কাহিনী স্থান পেয়েছে 'জীবন-স্মৃতি'তে। তাঁর এই বয়সের অধ্যায়টিকে কবি 'শ্লেভ ডাইনেষ্টি' বলে রসিকতা করেছেন। অবশ্য সে তাঁর হিমালয় যাত্রার আগের কথা। এই সব কারণে মায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল খুব কম, মাতৃ-বিয়োগ তাই তাঁর মনে খুব গভীর ছায়াপাতও বোধ হয় করতে পারেনি।

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে দাদাদের ও বৌদিদের সাহচর্য্য তাঁর মনে শিল্পানুরাগ সৃষ্টি করছিল কি ভাবে। এখন সেটা দ্রুত বিকশিত হয়ে চললো। 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক একটি তখনকার মাসিক পত্রে তিনি 'বনফুল' নামে একখানি আট-সর্গে বিভক্ত কাব্য-কাহিনী লিখতে সুরু করলেন। হিন্দু মেলার অনুষ্ঠানে এই সময় তিনি দিল্লীর দরবারকে বিদ্রূপ করে একটি দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেন এবং প্রকাশ্য ভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে নামেন 'অলীক প্রকাশে'র অভিনয়ে। সভা-সমিতিতে যোগদান ও অভিনয়ে অবতরণ এই তাঁর প্রথম। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এই সময় থেকে প্রসিদ্ধ 'ভারতী' পত্রিকা বেরুতে থাকে। ষোল বছরের বালক রবীন্দ্রনাথও এর একজন

লেখক হলেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তিনি একাদিক্রমে 'করুণা,' 'ভিখারিণী' এই দু-খানি উপন্যাস, 'কবি কাহিনী' আখ্যান কাব্য কতকগুলি কবিতা এবং 'দান্তে ও বিয়াট্রিস,' 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িণীগণ,' 'এ্যাংলো স্যাক্সন জাতি ও তাহাদের সাহিত্য' ইত্যাদি প্রবন্ধ লেখেন। এ ছাড়া বিদ্যাপতির অনুকরণে ব্রজবুলিতে লেখা কতকগুলি বৈষ্ণব পদাবলী ভানুসিংহের ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। বালক কবি চ্যাটারটনের বিবরণ তিনি পড়েছিলেন—তাঁরই অনুকরণে অপ্রচলিত প্রাচীন ভাষায় কবিতা লেখার ঝোঁক হয়েছিল বালক রবীন্দ্রনাথের। ভানুসিংহ তারই ফল। তখনকার সমালোচক মহল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের (ভানুসিংহের) এই কৌশল ধরতে পারেন নি।

সতেরো বৎসর বয়সে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গেলেন আমেদাবাদে। কিছুদিন এখানে ঘরে পড়াশুনা চললো। সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং জনৈকা পার্সী মহিলা তাঁকে ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজী আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে লাগলেন। উদ্দেশ্য তাঁকে ইউরোপ পাঠানো হবে। ১৮৭৮ সালে তিনি গেলেন লণ্ডনে। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সেখানে বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এলেন তাঁদেরই মধ্যে। প্রথমে তাঁকে ব্রাইটনের একটি স্কুলে ভর্ত্তি করা হল—সেখান থেকে তিনি গেলেন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে। বিখ্যাত লর্ড মোলির ভাই হেনরি মোলির কাছে তিনি পড়তে লাগলেন ইংরাজী সাহিত্য। এ ছাড়া শিখতে লাগলেন ইউরোপীয় সঙ্গীত, নৃত্য-

কলা এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও কমন্স সভায়ও যাওয়া-আসা করতে লাগলেন মধ্যে মধ্যে।

তখনকার ইংলণ্ড ছিল শান্তিপূর্ণ—ভিক্টোরিও ইংলণ্ডের চিত্র সেই সময়ের লেখা 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' বইয়ে কবি চমৎকার ভাবে এঁকেছেন। এই পত্রগুলি ধারাবাহিক ভাবে বের হয় 'ভারতী'তে। 'ভগ্ন হৃদয়' নাট্য কাব্যও তাঁর ইংলণ্ড প্রবাসের রচনা। কিন্তু ইংলণ্ডে তাঁর বেশীদিন থাকা হল না। দেড় বছরের মধ্যেই তিনি এলেন দেশে ফিরে এবং এখন থেকে একান্ত মনে সাহিত্য চর্চ্চাকেই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলেন।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি নাট্য, 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' কবিতা সংগ্রহ, 'রুদ্রচণ্ড' নাটক, 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস এবং বহু প্রবন্ধ তিনি এই সময়ে লেখেন। ঠাকুর বাড়ীর ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় হয় এবং তাতে স্বয়ং কবি বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মেডিক্যাল কলেজে অনুষ্ঠিত সভায় এই সময় তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতাও করেন। ইতিমধ্যে আর একবার ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্যে তাঁর বিলাত যাবার কথা হয়। জাষ্টিস আশুতোষ চৌধুরী এবং ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীর সঙ্গে তিনি যাত্রাও করেন —কিন্তু মাদ্রাজ থেকেই আসেন বাংলায় ফিরে এবং সিধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে চন্দননগরে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করে দেন। বলা বাহুল্য সব রকম পড়ার মতো আইন পড়াকেও

তিনি ইচ্ছে করেই ফাঁকি দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ধাত জানতেন—তাই তিনি তাঁর এই পলায়নকে সস্নেহ প্রশ্রয়েই অনুমোদন করলেন।

পনেরো থেকে তেইশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ওপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। এই প্রভাব কবির স্বাভাবিক সাঙ্গীতিক প্রতিভাকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়ে গান লেখাতেন—সেই গানে নিজে সুর সংযোগ করতেন। এ ছাড়াও সাহিত্য-সাধনায় তাঁকে নানাদিক থেকে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিতেন।

নাট্যাভিনয়ে, গীত চর্চ্চায়, সাহিত্য রচনায়, সর্ব্বভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন এই সময়ে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। উভয়ে সারস্বত সমাজ নামে একটি সাহিত্য-সঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন এবং আরো বহুবিধ ব্যাপারে ছিলেন একে অন্যের শ্রেষ্ঠ সহযোগী। এই মধুর সম্পর্কের ওপর ছেদ পড়লো জ্যোতিরিন্দ্র পত্নী কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে। তারপর থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আর বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। কৈশোর ও যৌবনের প্রথমাংশে সস্ত্রীক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্য্য কবির ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে প্রচুর আনুকূল্য করেছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে ও অন্যান্য রচনায় কবি কৃতজ্ঞ চিত্তে এই সাহচর্য্যের কথা স্মরণ করেছেন। ঐ সময়ের কয়েকখানি বইও তিনি উভয়কে উৎসর্গ করেছেন।

একুশ বৎসর বয়সে কবির ভাব-জীবনে সহসা একটি পরিবর্ত্তন আসে। কলকাতা যাদুঘরের নিকটবর্ত্তী সদর ষ্ট্রীটের একটি

জননী সারদা দেবী

বাড়ীতে থাকা কালে একদিন সকাল বেলা তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবী ও তার বিচিত্র জীবন-লীলা একটি নূতন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। এই নূতন দৃষ্টির প্রেরণায় তিনি লেখেন তাঁর প্রসিদ্ধ 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' কবিতা—

না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ !
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি—
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি !

'প্রভাত উৎসব' কবিতাতেও এই সুরের অনুরণণ শোনা যায়। এই দুটি কবিতা দিয়ে সুরু হল তাঁর নূতন কবিতার বই 'প্রভাত সঙ্গীত'। এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার এইখান থেকেই সূচনা, যদিও মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' বইয়েরও উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা কমলা দেবীর বিবাহ সভায় রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় একটি মালা পরিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই মালা নিজের গলা থেকে নিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথের গলায় এবং তাঁর সদ্য প্রকাশিত সন্ধ্যা সঙ্গীতের বিশেষ সুখ্যাতি করেন।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ছিলেন ঠাকুর বাড়ীর একজন বিশিষ্ট অতিথি—দ্বিজেন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব-সূত্রে তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন। ঠাকুর ভ্রাতৃবৃন্দ এবং তাঁদের

বধূরা, বিশেষ করে কাদম্বরী দেবী ছিলেন তাঁর কাব্যের একান্ত অনুরাগী। কাদম্বরীর মৃত্যুতে তাঁর দেওয়া একখানি কার্পেটের আসন স্মরণ করে চক্রবর্ত্তী কবি লিখেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ 'সাধের আসন' কবিতা। বিহারীলালের এই ঘনিষ্ঠ আনা-গোনা বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনার ওপর বিশেষ রকম প্রভাব বিস্তার করে।

'বাল্মীকি প্রতিভা'য়, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' এবং আরো কোন কোন রচনায় তাঁর ভাব ভাষা ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর পূর্ণ অনুসরণ দেখা যায়। পরবর্ত্তীকালে কবি এজন্যে বিহারীলালকে গুরু বলেই স্বীকার করেছিলেন।

'প্রভাত সঙ্গীতে'র পরই তিনি লেখেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্য এবং 'ছবি ও গান' কবিতা সংগ্রহ। এছাড়া সেকেলে রাজনৈতিক আন্দোলনের অসার বাকবাহুল্যকে আক্রমণ করে ও প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়ে ভারতীর পৃষ্ঠায় কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। 'কড়ি ও কোমল' এবং 'নলিনী' নাটিকা এর অল্প পরের রচনা।

বাইশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল। তার পত্নীর নাম ভবতারিণী, ঠাকুর পরিবারে এসে নাম হয় মৃণালিনী। ইনি ঠাকুর এষ্টেটের তত্ত্বাবধায়ক স্বর্গীয় বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা। মৃণালিনী ঠাকুর পরিবারের বধূ হবার মতো যথেষ্ট শিক্ষিতা এবং আধুনিক রুচি সম্পন্না ছিলেন না। তথাপি মহর্ষি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে যোগ্য মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক মনোনীত হন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পর্ব্ব শেষ করে 'প্রচার' আরম্ভ করেছেন—এই পত্রিকায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও চন্দ্রনাথ বসুর সহযোগিতায় তিনি তখন সুরু করেছেন নব্য হিন্দু-অভ্যুত্থানের আন্দোলন। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপনের সেই প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের চোখে অসার্থক মনে হল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধিরূপে এই আন্দোলনে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত আক্রমণের প্রতিবাদে তিনি লেখনী ধরলেন। অনেকদিন চললো এই বিতর্ক—'প্রচার' ও 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় স্থান পেতে লাগলো সেই সমস্ত বাদ-বিবাদ ও আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ। এই বিতর্কে কবি বিশুদ্ধ যুক্তি সহকারে যুগোচিত সংস্কারে ব্রতী হতে বললেন এবং যে কোন অভ্যাসদুষ্ট আচারকেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে ধামাচাপা দিতেও নিষেধ করলেন। বিতর্কের মীমাংসা হল না, কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্পর্ক তিক্ততায় পর্য্যবসিত হল।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই জ্ঞানদানন্দিনীর 'বালক' পত্রিকার কথা বলেছি। এই পত্রিকা বেরুতে আরম্ভ করলো এই সময় থেকে। রবীন্দ্রনাথ এতে তাঁর প্রসিদ্ধ 'রাজর্ষি' ও 'মুকুট' বই লিখতে সুরু করলেন। বিভিন্ন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ এবং সমাজ সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা অনেকগুলি পত্রও এতে প্রকাশিত হয়। বন্ধু শ্রীশ মজুমদারের সঙ্গে একত্রে বৈষ্ণব কবিতার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করলেন তিনি এবং স্বরচিত গানগুলি সংগ্রহ করে 'রবিচ্ছায়া' বইয়ে

গ্রথিত করলেন। তাঁর প্রবন্ধমালাও সংগৃহীত হল 'আলোচনা' নামক পুস্তকে। এই সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলকাতায়—এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজি। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে উদ্বোধন সঙ্গীত রচনা করেন, 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' এবং স্বকণ্ঠে কংগ্রেস মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান। তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা বেলার জন্ম এই সময়।

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি লিখলেন 'মানসী' কাব্য—তাঁর নিজের মতে তাঁর কাব্য-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সুরু হয় এইখান থেকে। ইতিমধ্যে কিছুদিন তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বোম্বাইয়ে কাটিয়ে এসেছিলেন—সেই প্রবাসের অবকাশেই তিনি লেখেন মানসীর কবিতাগুলি। এ ছাড়া সেকেলে দাদামশায় ও নব্য নাতির মধ্যে যুগ-ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক-বিতর্ক মূলক কল্পিত চিঠির একটি সংগ্রহও লেখেন। এর নাম 'চিঠিপত্র'। 'সমালোচনা' বইও এই সময়ের। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় কবি সমালোচনা সুরু করেছিলেন অত্যন্ত অল্প বয়সে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা মেঘনাদবধ কাব্যের বিরুদ্ধে। এটি লিখেছিলেন তিনি যখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল-সতেরো। পরে আরো কতকগুলি স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধীয় সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সবগুলি একত্র গ্রথিত হল আলোচ্য বইয়ে। এর পরবর্ত্তী তিন বৎসরে তাঁর উল্লেখ-যোগ্য রচনা হল 'মায়ার খেলা' গীতি নাট্য, 'রাজারাণী' ও 'বিসর্জ্জন' নাট্যকাব্য। এগুলি লিখিত হয়েছিল যথাক্রমে তাঁর সাতাশ,

আটাশ ও উনত্রিশ বৎসর বয়সে। 'মায়ার খেলা' তিনি লিখেছিলেন মিসেস সরলা রায়ের অনুরোধে জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী প্রতিষ্ঠিত 'সখী সমিতি'র সাহায্যার্থে অভিনীত হবার জন্যে। 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জ্জন' ঠাকুরবাড়ীর ঘরোয়া ষ্টেজে অভিনীত হয়েছিল। প্রথমটিতে রাজা বিক্রমের ভূমিকায় এবং দ্বিতীয়টিতে রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন স্বয়ং কবি।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটে, যাতে কবিকে ঐকান্তিক কাব্য-সাধনার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে হয় বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে। মহর্ষি এই সময় থেকে করলেন শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং রবীন্দ্রনাথকে দিলেন ঠাকুর এস্টেটের ষোল-আনা তদারকের ভার। বলাবাহুল্য এই থেকে হল তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের সূচনা, আর এর দ্বারাই হল তাঁর দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ। ইতিমধ্যে তাঁর দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রার সুবিধা হয়ে গেল। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিতের সঙ্গে একযোগে তিনি রওনা হলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীর বহুস্থান ঘুরে তিন মাস পরে তিনি দেশে ফিরলেন। ঠাকুর এস্টেটের ভার নিয়ে এবার তিনি শিলাইদহে তাঁর আস্তানা স্থাপন করলেন। এই সময়ের ভেতর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার জন্ম হয়েছে।

— ২ —

প্রথম তিরিশ বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবী জীবনের লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে স্থির করে নিতে পেরেছিলেন। স্কুল-কলেজের পরীক্ষা পাশ যেমন তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি, তেমনি কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির অনুসরণ করে জীবিকার্জ্জনে মনোযোগী হওয়াও তাঁর ধাতে পোষালো না। দু'দু'বার বিলাত গিয়েও তিনি অভিভাবকদের প্রত্যাশা ব্যর্থ করেই দিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে স্বাধীন ভাবে সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সেবার ভেতর দিয়েই তাঁকে সাফল্যের পথ খুঁজতে হবে। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকতা গ্রহণ, কংগ্রেসে যোগদান, কাব্য নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা, সবই তাঁর এই লক্ষ্যের অনুপূরক।

এই বয়সের মধ্যে সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগেই তিনি স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির যে পরিচয় দিলেন, তাতেই প্রমাণিত হল যে বাংলা সাহিত্যে তিনি যুগান্তর আনবেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ তদানীন্তন কবি ও সাহিত্যিকরা একবাক্যে তাঁর প্রতিভা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর যে বাদ বিবাদ হয়েছিল, অথবা অক্ষয়চন্দ্র যে তাঁকে উদ্দেশ করে 'ভাই হাততাল' লিখেছিলেন, তাতেও একথাই প্রমাণিত হয় যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সত্যকার শক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তা না হলে তখনকার সাহিত্যাধিপতি হয়ে তাঁরা কখনই তাঁর বিরুদ্ধে লেখনী ধরতেন না।

কৈশোর কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভায় সর্ব্বতোমুখিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যের আসরে যতই এগিয়ে আসতে লাগলেন, ততই নূতন নূতন পথে তাঁর সৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হয়ে চললো। দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে তিনি জমিদারির ভার নিয়েছিলেন এবং শিলাইদহে তাঁর বাসস্থান ঠিক করেছিলেন, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। শিলাইদহের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বসে তিনি দরদের দৃষ্টিতে পল্লী-বাংলার জীবন-ধারা লক্ষ্য করলেন—গ্রাম্য জীবনের নিভৃত অবকাশে সুখে-দুঃখে বয়ে চলেছে যে জীবন, তা থেকে বিষয় আহরণ করে তিনি এই সময়ে সুরু করলেন ছোট গল্প লেখা। তদানীন্তন সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'তে এই সমস্ত গল্প (পোষ্ট মাষ্টার ইত্যাদি) প্রকাশিত হতে লাগলো। দ্বিতীয় ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী' বইটিও বেরুলো এই সময়। এখান থেকেই তিনি সুরু করলেন 'সাধনা' মাসিকপত্র সম্পাদনা। এতে তিনি নিজে কবিতা গল্প প্রবন্ধ অজস্র ধারায় লিখতে লাগলেন এবং পরিবারস্থ নবীন লেখকদের বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করলেন সাহিত্য সেবায়। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা সুরু এই থেকেই। এ ছাড়া গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্র দুই বিখ্যাত শিল্পী এবং সঙ্গীতজ্ঞ দিনেন্দ্রও এখন থেকে তাঁর কলাচর্চ্চার দোসর হলেন—এঁরাও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।

প্রসিদ্ধ 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক এই সময়ের লেখা। এই নাট্য

কাব্যটি চিত্রিত করলেন অবনীন্দ্রনাথ। তার বিনিময়ে কবিও বইটি তাঁকে উৎসর্গ করলেন। ইতিমধ্যে বাংলা ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন আশ্রমের উপাসনা মন্দির স্থাপিত হল এবং ঐ বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে কবি কিছুদিন কাটিয়ে গেলেন শান্তি-নিকেতনে। বারো বৎসর বয়সে হিমালয় থেকে ফিরে একবার কিছুদিনের জন্যে তিনি শান্তিনিকেতন বেড়িয়ে গিয়েছিলেন মহর্ষির সঙ্গে। এইবার সম্ভবতঃ তাঁর দ্বিতীয় আগমন—যে শান্তিনিকেতনে তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের অনন্য কর্ম্ম-কেন্দ্র হয়েছিল, এই থেকেই সুরু হল তার সঙ্গে সংস্রব।

'সাধনা'র পৃষ্ঠায় কবি এই সময় যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, তাতে সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়। গতানুগতিক ব্যবস্থার সংশোধন ও যুগোচিত আদর্শে তাদের সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর আগে গঠনমূলক আন্দোলন বিশেষ কিছুই হয়নি। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান সমর্থন করে, তিনি দেখালেন যে বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার বাহন থাকায়, স্বাভাবিক নিয়মেই দেশের মনোবৃত্তি জাতীয়তা-বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' এবং 'ইংরাজের আতঙ্ক' প্রবন্ধে তিনি শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করে, উভয়ের পক্ষে কল্যাণের পথ কি তার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিলেন। শেষোক্ত প্রবন্ধটি তিনি পড়েন চৈতন্য লাইব্রেরীতে এবং বঙ্কিমচন্দ্র সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, জাতীয় পরিষদ গঠন, স্বদেশী দ্রব্য

ক্রয়, স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন আরো নানা সময়োচিত প্রসঙ্গের অবতারণা করে দেশকে সজাগ করে তুললেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর রচনায় যে সংস্কারকের ও উদারদৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্বপ্রেমিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, প্রথম যৌবনেই তার সূচনা হয়েছিল বাংলা ও বাঙালীর সংস্কার নিয়ে। 'ভারতী' ও 'সাধনা' এই দিক থেকে ছিল তাঁর প্রচার-বেদীস্বরূপ।

কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতির সাম্প্রতিক আলোচনায় মনোনিবেশ করলেও নিছক সাহিত্যের প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। শিলাইদহের স্নিগ্ধ গ্রাম্য আবেষ্টনীর ভেতর তাঁর কবি-প্রাণ ভাবে ও অনুভূতিতে অহরহ উদ্বেলিত হয়েছে। 'সোনার তরী'র কবিতাগুলিতে সেই ভাবনাভূতির বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। এই কবিতাগুলি এবং প্রসিদ্ধ 'বিদায় অভিশাপ' তিনি এখানেই লেখেন। জমিদারী পরিদর্শনের জন্যে তাঁকে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছে, কখনও বা যেতে হয়েছে উড়িষ্যায় এষ্টেট দেখতে। সেই পরিভ্রমণের পথে তিনি লিখে গিয়েছেন হয় কবিতা, নয় গল্প, নয় প্রবন্ধ। এক হিসাবে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সই তাঁর সব চেয়ে ফলপ্রসূ বয়স—তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ লেখারই জন্ম এই সময়ে। এ ছাড়া দেশের প্রত্যক্ষ বহু আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি এই সময় থেকে আস্তে আস্তে জড়িত হচ্ছিলেন।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ এই সময় স্বদেশী কাপড়ের কারবার সুরু করলেন। কলকাতায় স্থাপিত হল

একটি কাপড়ের দোকান এবং কুষ্টিয়ায় একটি চটকল। উভয় স্থলেই কবি তাঁদের সঙ্গে ব্যবসায়িক অংশীদার রূপে যোগদান করলেন।

তাঁর এই সময়ের কর্ম্মব্যস্ততা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। জমিদারি চালাচ্ছেন, ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছেন, সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদন করছেন, সভা-সমিতিতে যোগদান করে রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করছেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছেলে-ভুলানো-ছড়া সংগ্রহ করছেন, আবার তারই সঙ্গে কবিতা-গল্প রচনা করছেন, সাহিত্য সমালোচনা করছেন! কবি দ্বিজেন্দ্র-লালকে প্রশংসাত্মক সমালোচনার দ্বারা তিনিই এই সময় জন-সাধারণের কাছে পরিচিত করেছিলেন। পরে উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও হয়েছিল। 'পঞ্চভূতের ডায়েরী' নামক দার্শনিক রচনাটিরও জন্ম শিলাইদহে।

মহর্ষি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা এই সময় পৃথক হয়ে যাওয়ায়, ১৮৯৯ সালে ঠাকুর এষ্টেট ভাগ হয়ে গেল। মহর্ষির অংশ রইলো রবীন্দ্রনাথের তদারকে। 'চিত্রা' ও 'চৈতালী' কাব্য দু-খানির এবং 'নদী' নামক বর্ণনাত্মক দীর্ঘ কবিতাটির রচনা এই বৎসরেই সম্পন্ন হয়। যে 'জীবন দেবতা' কবিতাটি অনেকের মতে রবীন্দ্র-কাব্যের মূল-সূত্র স্বরূপ, তারও উদ্ভব এই সময়ে। উড়িষ্যা ভ্রমণের পথে কোন এক ফাঁকে তিনি 'মালিনী' কাব্যনাট্যটিও লেখেন। তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী এবার তাঁর সংগহীত কাব্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ করলেন। কবি এই সংস্করণের

জন্যে তাঁর সমুদয় মুদ্রিত রচনার পাঠ সংশোধন ও সংস্কার করে দিলেন। এর অল্পপরেই লিখলেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' রঙ্গনাট্য এবং তার অভিনয়ে স্বয়ং কেদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

মেজদা সত্যেন্দ্র ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই সময় নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হল। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের কার্য্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বাংলায় পরিচালিত হওয়ার অনুকূলে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখনকার ইংরাজী-নবীশদের মত বদলাতে কিছুতেই সমর্থ হলেন না। বিরক্ত হয়ে তিনি ফিরে এলেন। এই সময় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু লণ্ডন রয়েল সোসাইটিতে তাঁর গবেষণা সমূহের পরিচয় দিয়ে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং তাঁর বিলাত যাত্রায় তিনি সহায়তাও করেছিলেন প্রচুর। বন্ধুর এই সাফল্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আনন্দিত হলেন এবং তার উদ্দেশে একটি অপূর্ব্ব কবিতা উৎসর্গ করলেন। 'গান্ধারীর আবেদন', 'নরকবাস', 'সতী', প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্য-কবিতা গুলিও লিখলেন এই অবকাশে। ১৮৯৮ সালে গভর্ণমেণ্ট যে নূতন রাজদ্রোহ আইন প্রবর্ত্তন করলেন, তার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত টাউন হলের সভায় 'কণ্ঠরোধ' নামক প্রবন্ধে কবি জন-সাধারণের এই ন্যায়সঙ্গত নাগরিক অধিকারের বিরোধী আইনের তীব্র প্রতিকূলতা করলেন। স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলকের বে-আইনী গ্রেপ্তারেও তিনি সবিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় তার প্রতিবাদ করলেন। তিলকের মামলা চালানোর

উদ্দেশ্যে একটি অর্থ-ভাণ্ডার গঠন করা হল এবং কবি স্বয়ং তার জন্যে টাকা সংগ্রহ করতে লাগলেন।

পরের বৎসর কলকাতায় প্লেগ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করে দিলেন, যাতে এখানেও বোম্বাইয়ের মতো জনসাধারণের স্থবিধা ও সাহায্যের প্রতি ঔদাসীন্য না দেখানো হয়। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে একত্রে তিনি রোগাক্রান্তদের সাহায্যে অর্থ-ভাণ্ডার গঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করলেন। প্রাদেশিক সম্মেলনের ঢাকা অধিবেশনে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে বৎসর যে অভিভাষণ দিলেন, কবি বাংলায় তার সারমর্ম্ম জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে জমিদারবর্গের অসহযোগিতার তিনি তীব্র নিন্দা করলেন স্বয়ং জমিদার হয়েও। বলেন্দ্রনাথদের কারবার ইতিমধ্যে কাহিল হয়ে এলো—চটের কারবার কবি বন্ধ করে দিলেন এবং সমস্ত লোকসানের দায়িত্ব নিলেন নিজের কাঁধে। তাঁর স্নেহভাজন বলেন্দ্রনাথের এই বছরেই মৃত্যু হয় এবং সেই শোক কবিকে প্রবলভাবে আঘাত করে।

'সাধনা' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এই সময় কিছুদিনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদন ভার নিলেন। তারপর 'ভারতী'র দায়িত্ব গেল স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবীর হাতে। ভারত ইতিহাসের বীরত্ব ও ত্যাগ মহিমার উপাখ্যান গুলি নিয়ে এই সময় তিনি লিখলেন 'কথা'র প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি। 'ক্ষণিকা'রও রচনা

এই সময়ে। শিলাইদহের বাড়ীতে বসে কবি মাত্র দু'দিনে 'ভারতী'র জন্যে 'চিরকুমার সভা' বইটিও লেখেন। প্রথমে এ ছিল একটি রঙ্গ-উপন্যাস, পরে কবি একে নাটকে রূপান্তরিত করেন। ঠাকুর পরিবারের প্রিয় বন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাভাজন কবি বিহারীলালের জ্যেষ্ঠপুত্র শরৎ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে এই বৎসর তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার বিবাহ হয়। এই বৎসরই ৭ই পৌষ উপলক্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবি প্রথম উপাসনা-বেদীতে আচার্য্যের কাজ করলেন।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছিল। মহর্ষির আদর্শ, কৈশোরে তাঁর কাছে উপনিষদে শিক্ষালাভ, রবীন্দ্রনাথের মনে প্রাচ্য সংস্কৃতি ও জীবন-নীতি সম্বন্ধে যে সুগভীর শ্রদ্ধা সঞ্চার করেছিল, তাই তাঁকে শান্তিনিকেতনের প্রতি আকৃষ্ট করলো। ১৯০১ সালে জমিদারির ভার পরিত্যাগ করে তিনি সপরিবারে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে এবং মহর্ষির সম্মতিক্রমে এখানে প্রাচ্য আদর্শে 'ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। কবি স্বয়ং ছাত্রদের শিক্ষার ভার নিলেন—তাদের সঙ্গে খেলাধূলো মেলামেশা করতে লাগলেন এবং সহজ আনন্দে যাতে তারা হাসি-খুসির ভেতর দিয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে, যাতে তাদের কল্পনা ও সহজ অনুভূতি পাঠ্যপুস্তকের চাপে বিকৃত না হয়, তার জন্যে তাঁর সমস্ত বুদ্ধি ও মনীষা একযোগে নিয়োগ করলেন।

এই কাজে তিনি সহযোগী পেলেন জগদানন্দ রায়, উইলিয়াম

লরেন্স, স্বামী অণিমানন্দ এবং পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণবকে। পরে এঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং সতীশচন্দ্র রায়। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় অভিভূত বাঙালীর চোখে নূতন একটি আদর্শের পথ খুলে দিল। কতক গুলি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে এলো এখানে শিক্ষালাভ করতে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় চালানোর ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করা বেশ কঠিন হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথকে একক ভাবে এই ব্যয় বহন করতে প্রচুর বেগ পেতে হল। তিনি পুরীর বাড়ী বিক্রী করে ফেললেন এবং তাঁর স্ত্রীও সানন্দে নিজের অলঙ্কারগুলি বিক্রী করে স্বামীকে এই অর্থসঙ্কটে সহায়তা করলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে আকস্মিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে কবি-পত্নী লোকান্তরিতা হলেন এবং এখানেই রবীন্দ্র-জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু হল।

মৃণালিনী দেবী ঠাকুর পরিবারে এসেছিলেন অত্যন্ত অল্প বয়সে। পল্লীগ্রামের সরলচিত্ত বালিকা তিনি এই অভিজাত পরিবারে বধূ হয়ে এবং এত বড় মহনীয় প্রতিভার অধিকারী কবির যোগ্য পত্নী হয়ে, নিজের অসাধারণতারই পরিচয় দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু কর্ম্মব্যস্ত ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গেই দেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয়—তাঁর পারিবারিক জীবনের খবর অনেকের জানা নেই। তাই কবির দাম্পত্য-জীবন ও তাঁর গার্হস্থ্য রূপ অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু কবি যে স্বামী ও পিতা রূপে ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল ও কর্ত্তব্য

পরায়ণ, অত্যন্ত সুবিবেচক ও একনিষ্ঠা সম্পন্ন, তা জানা যায় ঠাকুর পরিবারের বধূ হেমলতা দেবী লিখিত 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, কি ভাবে কবি তাঁর পুত্র-কন্যাদের সস্নেহ যত্নে মানুষ করেছেন, কি ভাবে পীড়িতা পত্নীকে অক্লান্ত মমতায় সেবা করেছেন—কবি-পত্নীও তাঁর স্বামীর প্রত্যেকটি কাজে কি ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের মতো গুণী, জ্ঞানী ও ধনীর পত্নী হয়েও কি ভাবে দুঃখ-কষ্ট ও কৃচ্ছ্রতা হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছিলেন! পত্নী-বিয়োগে ব্যথিত হয়ে কবি এই সময় তাঁর উদ্দেশে লিখেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ, আর মাতৃহীন শিশু শমীন্দ্রকে ভোলাবার জন্যে প্রসিদ্ধ 'শিশু' কাব্য।

কিন্তু এইখানেই তাঁর দুর্ভাগ্যের পালা শেষ হল না। তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা (এঁর বিবাহ হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে—সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রতিভাবান চিকিৎসক) মাতার মৃত্যুর ছয় মাস পরে মারা গেলেন। পত্নীর শোকে অধীর কবি কন্যার বিয়োগে একেবারে ভেঙে পড়লেন। সেই সঙ্গে নাবালক ছেলে শমীন্দ্র এবং কন্যা মীরার লালন-পালন নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কি করে তিনি একাধারে মা ও বাবা হয়ে এঁদের মানুষ করেছেন, তারই সঙ্গে তাঁর বহুমুখী কর্ম্মক্ষেত্রের প্রত্যেকটি আহ্বান যথাযথ ভাবে পালন করে গেছেন, সে কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়!

১৯০১ সালে শ্রীশ মজুমদারের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ-দর্শন' নব পর্য্যায় প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এর পৃষ্ঠায় তিনি ধারাবাহিক ভাবে লিখে চললেন 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাস, এ ছাড়া ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্য। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে নব পর্য্যায় 'বঙ্গ-দর্শন' তদানীন্তন বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক মুখপত্র হয়ে দাঁড়ালো এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ মনীষীরা লেখকরূপে এতে যোগদান করলেন। এখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে সুরু হল বাংলার সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট গুণীদের দ্বারা সে নেতৃত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকৃত হল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে হঠাৎ বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দিল। তরুণ কবি সতীশ রায় মারা গেলেন এবং ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় সাময়িক ভাবে শিলাইদহে স্থানান্তরিত করতে হল। এই সময় অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পাদন করে নয় খণ্ডে প্রকাশিত করলেন। তাঁর নাটক, উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধগুলিও সংগৃহীত গ্রন্থাবলীরূপে 'হিতবাদী' কর্তৃক প্রকাশিত হল। এছাড়া ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্যে নানা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকও কবি লিখলেন অনেকগুলি। এইগুলির সম্মিলিত আয়ে শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হল। বলে রাখা দরকার যে তখনো শান্তিনিকেতনে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার জন্যে ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু নেওয়া হত না।

বাল্যে রবীন্দ্রনাথ
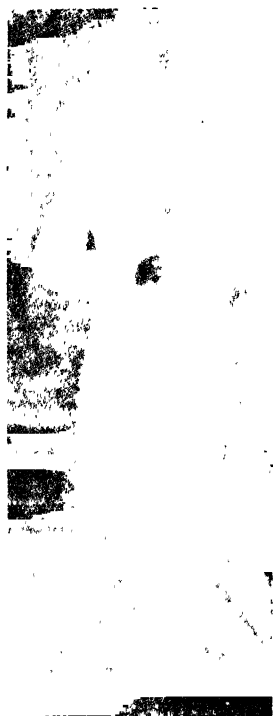
কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ

(প্রথম বিলাত যাত্রার সময়)

দেশের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির জন্যে নানা পথে নিজের প্রতিভাকে কবি আকৈশোর নিয়োজিত করেছিলেন। এখন থেকে তিনি ধীরে ধীরে নেমে এলেন প্রত্যক্ষ কর্ম্মক্ষেত্রে। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি স্বরাষ্ট্রিক শাসন লাভের পক্ষে ও পরকীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাতে লাগলেন প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সাহায্যে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করেন—এই প্রবন্ধে তিনি দেখান আবেদন-নিবেদন বক্তৃতা ও প্রস্তাব গ্রহণ ছেড়ে দেশকে অবহিত হতে হবে আত্ম-সংস্কারে। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে হবে দেশের শিক্ষা, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাষ্ট্রবিধি পুনর্গঠনে। এই সময়ের লেখা 'রাজকুটুম্ব,' 'ঘুষোঘুষি', 'রাজা-প্রজা' প্রভৃতি রচনাতেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। এক বৎসর পরে সমস্ত দেশ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো যে স্বদেশী আন্দোলনে, প্রকৃত পক্ষে তার আবহাওয়া এই ভাবে তৈরী করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথই।

১৯০৫ সালে মহর্ষি দেহরক্ষা করলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ এলেন স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করতে। এই সময় কলকাতায় ই-বি হ্যাবেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় আর্ট স্কুল স্থাপিত হল। ভগিনী নিবেদিতা, জাপানী পণ্ডিত কাউন্ট ওকাকুরা এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রধান উদ্যোগী। ভারতীয় চিত্রকলা আজ যে বিশিষ্ট মর্য্যাদার অধিকারী হয়েছে, তার পেছনে আছে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের

সাধনা ও রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা, এ কথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই।

এই সময় লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্কল্প করলেন। ১৯০২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উৎসবে তিনি প্রাচ্যদেশবাসীদের সম্বন্ধে যে অশিষ্ট উক্তি করেছিলেন, তাতেই সমস্ত দেশে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগে তা দাবানলের মতো জ্বলে উঠলো এবং সমগ্র বাংলা জুড়ে সুরু হল প্রবল আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ নেমে এলেন সেই আন্দোলনে। টাউন হলে ১৯০৫ সালে যে সভা হল, তাতে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে তিনি পাঠ করলেন তাঁর সর্ব্বজনবিদিত বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় তিনি এক দিকে প্রচার করলেন প্রতিক্রিয়াশীল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগিতা, অন্যদিকে জ্ঞানে-কর্ম্মে বিত্তে-ব্যবসায়ে দেশবাসীর স্বাবলম্বন। এই আন্দোলন যে কেবলমাত্র বাদ-প্রতিবাদেই পর্য্যবসিত হয়নি, দেশবাসী যে স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবর্ত্তনের দ্বারা বৈদেশিক বণিক-সরকারকে হাতে-কলমেও কাবু করার কাজে অগ্রসর হল, সে অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক পরিকল্পনার জন্যে। বলা যেতে পারে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই আন্দোলনের প্রাণ, আর রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন তার আত্মা।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ বাংলার অবিচ্ছিন্ন একাত্মতার প্রতীক স্বরূপ রাখী-বন্ধন উৎসব প্রবর্ত্তন করলেন। এই উপলক্ষে রচিত

তাঁর প্রসিদ্ধ গান, 'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান', তখন জন-মনে প্রবল সাড়া তুলেছিল। আরো অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গানই তিনি লেখেন এই সময়ে এবং স্বয়ং শোভাযাত্রা সহকারে এই সমস্ত গান গেয়ে তিনি সমস্ত দেশ তোলপাড় করে তুললেন। ছাত্রদের রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান বা 'বন্দে মাতরম্' গান গাওয়া নিষিদ্ধ করে গবর্ণমেণ্ট যে সার্কুলার জারী করলেন, ছাত্রদের এক বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি রূপে তার প্রতিবাদ করলেন একটি বক্তৃতায়। স্বদেশী আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে চালানোর জন্যে একটি জাতীয় ধন-ভাণ্ডার খোলা হল—রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একদিনের অধিবেশনেই এর জন্যে উঠলো পঞ্চাশ হাজার টাকা। রবীন্দ্রনাথ তখনকার যুবক সমাজের হয়েছেন এমনই প্রিয়।

— ৩ —

পনেরো থেকে তিরিশ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সমগ্রতা লাভ করেছিল, তা সম্পূর্ণতা লাভ করলো তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। এখন থেকে জ্ঞান ও কর্ম্মের, শিল্প ও সংস্কৃতির সর্ব্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়েই কাটতে লাগলো তাঁর জীবন এবং বোঝা গেল যে সমসাময়িক কালের সকলকে ছাপিয়ে উঠবেন তিনি প্রতিভা ও মনীষার প্রদীপ্ত প্রভায়। তখনকার দিনে বাংলা দেশে প্রথম শ্রেণীর মনীষা

ও প্রতিভা বিরল ছিল না। রাজনীতিক ক্ষেত্রে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিরা। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগেও বড় নামের অভাব ছিল না। কাব্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাশ; নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু; উপন্যাসে জলধর সেন, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়; গদ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রিয়নাথ সেন, সুরেশ সমাজপতি প্রভৃতি তখনকার উদীয়মান বা প্রখ্যাত লেখকরা ছিলেন দেশের মর্ম্মস্থান অধিকার করে। এই সমসাময়িকের জনতা ভেদ করে, সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ—যিনি একাধারে সাহিত্যের সকল শাখায় সমান দক্ষ এবং কোন শাখাতেই গতানুগতিকতার অনুগামী নন। দেশ সবিস্ময়ে এই সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ সাহিত্য-নায়কের নেতৃত্ব মেনে নিলে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম প্রাণ-শক্তি শুধু সীমাবদ্ধ রইলো না সাহিত্যের ক্ষেত্রে—আমরা আগেই দেখিয়েছি যে তিনি একই সঙ্গে জমিদারী চালাচ্ছেন, ব্যবসা করছেন, একের পর এক পত্রিকা সম্পাদন করছেন, নূতন নূতন নাটকের অভিনয়ে নামছেন, স্বদেশী আন্দোলনে দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করছেন, ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় চালাচ্ছেন, তারই সঙ্গে মাতৃহীন পুত্র-কন্যাদের

সমান্তে পালন করছেন! এত কাজ এবং এত বহুমুখী ও বিচিত্র কাজ একসঙ্গে চালানো, তারই ভেতর সৃজনী-শক্তিকে সাহিত্যের নব নব পথে অব্যাহত বেগে প্রবাহিত করা যে কি অসম্ভব ব্যাপার, তা সহজেই যে-কোন সাধারণ বুদ্ধির লোক বুঝতে পারেন।

স্বদেশী আন্দোলনের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এই আন্দোলন বঙ্গ-ভঙ্গ থেকে সুরু হয়ে ক্রমে সর্ব্ব-ভারতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। রবীন্দ্রনাথ সেই বিক্ষোভে কত বড় অংশ নিয়েছিলেন, তারও আমরা আভাষ দিয়েছি। কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই ১৯০৭ সালে তিনি সরে গেলেন রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করলেন শান্তিনিকেতনের সেবায়। কবির এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধান নিয়ে পরবর্ত্তীকালে প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছে প্রচুর। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে প্রবন্ধে, বক্তৃতায় ও গানে দেশের যুব-শক্তিকে উদভ্রান্ত, বিপর্যস্ত ও উত্তেজিত করে, তাদেরকে অসহায় ভাবে বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলে ভাব-বিলাসী কবি এই আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ততার পরিচয় দেননি। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের এই অন্তর্দ্ধানের পেছনে ভাব-বিলাস বিন্দুমাত্র ছিল না— তিনি যখন দেখলেন, আন্দোলন যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সুরু হয়েছিল তা সার্থক হয়নি, আত্মঘাতী উত্তেজনায় তা শুধু শক্তিক্ষয়ই করছে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট উন্মাদনায় অনুচিত পথে পা বাড়াচ্ছে, তখন তিনি এ থেকে সরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে

করলেন। এই স্বদেশী আন্দোলন শেষকালে রক্তাক্ত বিপ্লবের বাঁকা পথে কি ভাবে নিষ্ফল হয়েছে তা আমরা সকলেই জানি, তাই রবীন্দ্রনাথের এই পূর্ববাক্যে সরে-যাওয়া নিয়ে আমাদের কোন ক্ষোভ নেই।

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার' প্রবন্ধে কবি তাঁর অবলম্বিত নীতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখান যে সত্যকার স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সমাজ-ব্যবস্থার আনুপূর্ব্বিক সংশোধন দরকার—জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও মূঢ়তার দাসত্ব থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করতে না পারলে, বৃথা উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে কোন লাভ নেই। বরং সেই অপক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেশের পক্ষে অধিকতর মারাত্মক হওয়ারই সম্ভাবনা। তদানীন্তন রাজনীতিক সমাজে এই প্রবন্ধ নিয়ে বাদ-বিবাদ চলতে লাগলো প্রচুর, কিন্তু কবি আর ফিরে এলেন না রাজনীতির মধ্যে।

এর কিছু আগেই সুরু হয়েছিল কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর বিবাদ—তারই জের চলছিল তখনো। 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' বইয়ে কবি তাঁর জীবন ও কাব্য-সৃষ্টির মূল-সূত্র বিশ্লেষণ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে কবি তাঁর কাব্য-সৃষ্টির মূলে যে ঐশী শক্তির প্রেরণা দাবী করেছিলেন, তাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের আপত্তি। তিনি কবির 'চিত্রাঙ্গদা' এবং বহু প্রেম-সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে

চাইলেন যে যৌন-আবেদন বহুল সেই সমস্ত লেখা ভাগবতী প্রেরণা সঞ্জাত নয়—রীতিমত অশ্লীল ও দুর্নীতিদুষ্ট। কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, উভয়ে পরে ঘনিষ্ঠ বান্ধবতাও হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে কি কারণে বলা কঠিন উভয়ের সেই মধুর সম্পর্কের অবসান হয়ে গেল। বাইরে এটা সাহিত্য কলহ রূপে দেখা দিলেও ঠিক তা নয়—রবীন্দ্রনাথের অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যাঁদের ঈর্ষার বস্তু ছিল, তাঁরাই দ্বিজেন্দ্রলালকে করেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে উৎসাহিত, যার ফলে অত বড় রসিক ও রসজ্ঞ হয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল কল্পিত অভিযোগ খাড়া করে তুলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু এখানেই শেষ নয়, রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তিনি 'আনন্দ বিদায়' নামক প্রহসন লিখেছিলেন। এই বিবাদে রবীন্দ্রনাথ যে সংযম ও মর্য্যাদা বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। একবার মাত্র তিনি লেখনী ধরেছিলেন এবং তাতেও শিষ্টতা এবং শালীনতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করেছিলেন।

এই সমস্ত সাহিত্যিক গালাগালি একদিকে, অন্যদিকে রাজনীতিক গালাগালি—তারই ভেতর নিবিষ্ট চিত্তে কবি লিখে গেলেন তাঁর 'খেয়া' কাব্য এবং 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে লেখা স্বরু করলেন তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোরা'।

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় তিনি 'ভাণ্ডার' নামে একটি নূতন মাসিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন—তার পৃষ্ঠায় দেশের

অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার উন্নয়নের উপায় সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করবার জন্যে। এই সময় থেকে দেশের কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির প্রশ্ন তাঁর মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়। এই দিক থেকে প্রত্যক্ষভাবে দেশকে সেবা করবার উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীশ মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা শিখতে পাঠান।

এই বৎসর কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মিলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যক্রমের প্রাথমিক খসড়া রচনা করে দেন। এই উপলক্ষে সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে তিনি কতকগুলি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। পরের বৎসর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র মারা গেল কলেরায়।

১৯০৮ খৃস্টাব্দে পাবনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করলেন। এই সম্মেলনে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধন এবং গ্রাম্য জীবনের পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে অভিভাষণ দেন, তাতে তদানীন্তন যুবক-সমাজ বিশেষ ভাবে কর্ম্মে উৎসাহিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা লক্ষ্য করার পর থেকেই কবি হৃদয়ঙ্গম করলেন, আগে গঠনমূলক কাজের দ্বারা আত্মশক্তি ও আত্মসংহতি অর্জ্জন করতে হবে, তারপর স্বাধীনতার আশা। স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কা যখন বোমা আন্দোলনে পর্য্যবসিত হল, কলকাতা মাণিকতলায় বোমার কারখানা ধরা পড়লো, মজঃফরপুরে সাহেব খুন হল, বারীন্দ্র

ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা ধরা পড়লেন, তখন কবি আন্দোলন থেকে সরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এত বড় সাংঘাতিক পরীক্ষার ভেতর জাতিকে নির্বিবাদে নামতে দেওয়া অনুচিত ভেবে তাঁকে নীরবতা ভঙ্গ করতে হল। যে নিপীড়ন ও শোষণ-নীতির ফলে দেশ এই ভয়ানক পথে আপনার মুক্তি খুঁজতে বেরিয়েছিল, সেই দুষ্ট শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আক্রমণ করলেন 'পথ ও পাথেয়' নামক প্রবন্ধে এবং যাঁরা এই ভ্রান্ত পথে দেশকে বন্ধন মুক্ত করতে অগ্রসর হলেন, তাঁদের আন্তরিকতা, শৌর্য্য ও ত্যাগশীলতা স্বীকার করেও তিনি তাঁদেরও সতর্ক করে দিলেন— এ পথ নয়, এ পথে মুক্তির আশা নেই। এর প্রায় সমসাময়িক 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও তিনি এই প্রসঙ্গকে রূপকের সাহায্যে বোঝাতে চাইলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি দেখালেন, অহিংস অসহযোগের দ্বারা কি ভাবে দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হতে হবে। বলা বাহুল্য, মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন এর অনেক পরে।

পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করার পর শান্তিনিকেতনে প্রথম সমারোহ করে তাঁর জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হল। এই সময় বহু অনুরাগীর অনুরোধে তিনি নিজের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতি-কথা লেখা সুরু করলেন—প্রবাসীতে প্রকাশিত সেই বিখ্যাত 'জীবন স্মৃতি'র উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ইতিমধ্যে তিনি লিখেছেন 'শারদোৎসব' গীতিনাট্য, 'রাজা' রূপক নাট্য এবং 'গীতাঞ্জলি'র বেশীর ভাগ গান। তাছাড়া শান্তি-

নিকেতনে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি নাটকের অভিনয়ে মূল ভূমিকা-গুলিতেও অবতীর্ণ হয়েছেন—'শারদোৎসবে' সন্ন্যাসীর ভূমিকায়, 'প্রায়শ্চিত্তে' ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় এবং 'রাজা'য় ঠাকুরদার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় যে কত মনোজ্ঞ হয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের লেখা স্মৃতি-কথায়।

কবির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে মহা সমারোহে একটি মানপত্র দেওয়া হল। এই উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে যে বিরাট জন সমাবেশ হয়েছিল, বাংলা দেশের ইতিহাসে কোন সাহিত্যসেবীর নামে কোন দিন এত বড় জনতা হয়নি। অনেকের ধারণা, পাশ্চাত্য জগতে সম্মানিত হবার আগে বাংলা দেশ কবির সম্বন্ধে কর্তব্য পালন যথাযথ ভাবে করেনি। দুর্ভাগ্য বশতঃ কবি নিজেও সময় সময় অনুরূপ মতই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু টাউনহলের এই অনুষ্ঠানে বা ইতিপূর্ব্বের রাজনৈতিক বক্তৃতা মঞ্চে দেশের জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীরা তাঁকে যে কতখানি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তা আজ ভুলে গেলে চলবে না।

কবির বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত 'জনগন মন অধিনায়ক' এই সময়ের রচনা। প্রসিদ্ধ 'অচল আয়তন' এবং 'ডাকঘর' নাটকও লেখেন এই সময়। 'অচল আয়তন' প্রকাশিত হওয়ার পর সনাতনী হিন্দু মহলে তা নিয়ে প্রচুর হৈ-চৈ হয়—যে বিবেচনাহীন অন্ধ সংস্কারের প্রাচীরে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথকে আমাদের সমাজ অবরুদ্ধ করে রেখেছে, এই রূপক নাট্যে কবি

তার ওপর নির্ম্মম বিদ্রূপের কষাঘাত করেছিলেন বলেই রক্ষণশীল সমাজের নাড়ী এত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

এই সময় দেশে একটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা চলছিল। কবি তার উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে চমৎকার একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় বা ওভারটুন হলে প্রদত্ত এরই সমকালীন 'ভারতীয় ইতিহাসের ধারা' বক্তৃতায় কবি হিন্দু আদর্শ ও শিক্ষা-পদ্ধতির মূল-সূত্র বুঝিয়ে, যুগোচিত পন্থায় কি ভাবে আজ তাদের পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে, তার পথ নির্দ্দেশ করেছিলেন। এর কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী 'তপোবন' প্রবন্ধেও একই সুরের অনুরণণ শোনা যাবে। এই তিনটি প্রবন্ধে ভাবী 'বিশ্বভারতী'র প্রাথমিক পরিকল্পনা দানা বাঁধছিল—সে দিক থেকে রবীন্দ্র-জীবনের পরবর্ত্তী পরিণতির এরা পথ নির্দ্দেশক।

পত্নী-বিয়োগের পর কবি সমস্ত জীবনকে পারিবারিক আবেষ্টনীর গণ্ডী থেকে বিচ্ছিন্ন করে একান্ত ভাবেই জ্ঞান ও কর্ম্মের সেবায় নিয়োগ করেছিলেন। একমাত্র নাবালক ছেলে শমীন্দ্র—সেও যখন মারা গেল, তখন কবির জীবনে রইলো না আর তথাকথিত কোন ঘরের বন্ধন। বস্তু-সংসারের মধ্যে থেকেই তিনি ছাপিয়ে উঠলেন সব কিছুকে এবং পরবর্ত্তী সমস্ত জীবনটাই তাঁর কেটে গেল এই একান্ত কর্ম্মমুখিতা নিয়ে। ইতিমধ্যে রথীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন আমেরিকা থেকে এবং শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। কবি তাঁকে

তখন দিলেন জমিদারী তদারকের ভার। নিজে জমিদারী চালানোর সময় লক্ষ্য করেছিলেন, এদেশের অবৈজ্ঞানিক কৃষি-ব্যবস্থার পরিণাম এবং সেই সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন কৃষি-সর্ব্বস্ব বাংলা দেশের অসহায়তা। অনিশ্চিত ও দৈবাধীন শস্য সম্পদের মুখ চেয়ে বেঁচে না থেকে, যাতে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সেচ, সার-প্রয়োগ ও যান্ত্রিক উৎপাদনের দ্বারা দেশ নিরন্নতার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে, তার জন্যেই তিনি পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করতে। আশা করলেন, এবার তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেবে। রথীন্দ্রনাথও সানন্দে গেলেন পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে এবং কবি রইলেন শান্তিনিকেতনের সেবায় নিরত।

এই সময় অর্থাৎ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বারের জন্য কবির ইউরোপ যাবার সুযোগ হল। যাত্রার পথে অবসর বিনোদনের জন্যে তিনি 'নৈবেদ্য', 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'র কতকগুলি বাছাই করা কবিতা ও গান সরল ইংরাজী গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। লণ্ডনে শিল্পী রদেনষ্টিনের বাড়ীতে থাকা কালে কথা-প্রসঙ্গে একদিন তাঁকে তিনি দেখালেন এই অনুবাদগুলি। রদেনষ্টিন মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর বাড়ীতে ইয়েটস্ আর্ণেস্ট রিস্, হেনরি নেভিনসন, মে সিনক্লেয়ার, ট্রিভেলিয়ান, ষ্টপফোর্ড ব্রুক প্রমুখ বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের একদিন আমন্ত্রণ করলেন এই অনুবাদগুলি শোনাবার জন্যে। সেই সময় স্বয়ং ইয়েটস কবিতাগুলি আবৃত্তি করে গেলেন এবং শ্রোতৃবর্গ সকলেই বিমুগ্ধ

বিস্ময়ে ভারতীয় কাব্য সাহিত্যের এই প্রাঞ্জল ইংরাজী অনুবাদ উপভোগ করলেন। এঁদেরই আগ্রহে লণ্ডন ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে বই আকারে কবিতাগুলি গ্রথিত হল। এই হল ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'। রদেনষ্টিন এর প্রারম্ভে আঁকলেন কবির একখানি রেখাচিত্র এবং ইয়েটস্ সবিস্তারে রবীন্দ্র-কাব্যের মর্ম্ম বিশ্লেষণ করে লিখলেন এর ভূমিকা। এইখান থেকেই সুরু কবির ইউরোপীয় খ্যাতি। দেশে যিনি একাধারে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিক নেতা ও ধর্ম্মবেত্তা, সম্পাদক ও সাহিত্যিক, কবি ও সুরস্রষ্টা রূপে শতমুখে প্রসারিত প্রতিভায় করেছিলেন সকলের চিত্ত জয়, এখন থেকে সেই অসামান্য কবির মনীষা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লো সমস্ত জগতে। দেশ-কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে, এখন থেকেই তিনি হলেন বিশ্বকবি। কিন্তু এ কিছুদিন পরের কথা। ইতিমধ্যে কবি ইংলণ্ড থেকে গেলেন আমেরিকায়। সেখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা দিলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ সম্বন্ধে এবং রচেস্টারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে 'জাতি-সংঘাত' সম্বন্ধে। ১৯১৩ সালের প্রারম্ভে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতাগুলি দিলেন, তাই পরে সঙ্কলিত হয়েছে তাঁর 'সাধনা' নামক ইংরাজী বইয়ে। আমেরিকা থেকে ইংলণ্ড হয়ে ঐ বৎসরই তিনি দেশে ফিরলেন। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত গীতাঞ্জলি ইউরোপীয় রসিক-সমাজে বিশেষ আদৃত হয়েছে এবং ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশ করেছেন তার একটি নূতন সংস্করণ।

দেশে ফেরার অল্প দিন পরেই জানা গেল যে সুইডিস একাডেমি ঐ বৎসরের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজে সম্মানিত করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর কিছু পূর্বেই তাঁকে সম্মানজনক ডি-লিট উপাধি দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন— দুর্ভাগ্যক্রমে বৈদেশিক সম্মান পাবার পরই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে একটি অতিশয় অপ্রীতিকর ব্যাপার হয়ে গেল। কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে উল্লসিত হয়ে বাংলার একদল কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক স্পেশাল ট্রেণ যোগে শান্তি-নিকেতনে গেলেন তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করতে। কবি এই সময় তাঁদের প্রতি সময়োচিত দাক্ষিণ্য দেখাতে পারলেন না, বরং অত্যন্ত রূঢ়তার সঙ্গে তাঁদের সেই শ্রদ্ধা নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করলেন। বিদেশীর হাতে সম্মানিত হবার আগে দেশ তার কবিকে সম্মান দেয়নি বলে, তিনি তাঁদের উদ্দেশে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অর্ঘ্য বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা এতে বিশেষ ব্যথিত হলেন এবং দেশের সংবাদপত্রে এই নিয়ে বেধে গেল তুমুল বাদ-বিবাদ। বলা বাহুল্য কবি ইউরোপে যে সম্মান পেয়েছিলেন, দেশে তা পাননি—কিন্তু যে দেশে মধুসূদন অনাহারে দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, সে দেশে আযৌবন তিনি পেয়েছিলেন দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি। রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক মতদ্বৈধ হেতু যাঁরা তাঁকে আক্রমণ

করেছিলেন বা তাঁর অনিষ্ট সাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের আমরা প্রশংসা করি না---কিন্তু নাম-গোত্র হীন অসংখ্য দেশবাসী ছিল তাঁর পিছনে। তাদের রঙ্গমঞ্চ কল্লোলিত হয়েছে তাঁর নাটকের অভিনয়ে, তাদের শিক্ষায়তন, সংস্কৃতি-সভা, রাজনৈতিক বক্তৃতা-মঞ্চ মুখরিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধে-বক্তৃতায়-গানে—তাদের গৃহাঙ্গণ মধুর হয়েছে তার কাব্যের আবৃত্তিতে, গানের ঝঙ্কারে, গল্প-উপন্যাসের অধ্যয়নে -ইউরোপীয় সম্মান লাভের বহু আগেই তা হয়েছে। সেই দেশবাসীর সম্পর্কে কবির মনে কোন বেদনা থাকা উচিত ছিল না।

১৯১৪ সালে বেধে গেল ইউরোপের মহাসমর এবং কবি স্বয়ং গিয়ে এই পুরস্কার নিয়ে আসতে পারলেন না। বাংলার ছোট লাট লর্ড কারমাইকেলের মারফৎ এই প্রাইজ—প্রায় এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা, একটি মানপত্র ও একটি স্বর্ণপদক—তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। এই উপলক্ষে কলকাতা লাট প্রাসাদে একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন হল এবং সরকারী বেসরকারী বহু ব্যক্তি এখানে সমবেত হয়ে কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। ইংলণ্ড থেকে উইলিয়াম পিয়ার্সন এবং ভারত-বন্ধু চার্লস এণ্ড্রুজ এসে যোগ দিলেন এতে শিক্ষক রূপে। বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুও এই সময়ে এলেন।

এই সময় বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত

'সবুজ পত্র' নামক একটি মাসিক যুগান্তরের সূচনা করলো। তথাকথিত লেখ্য ভাষা ছেড়ে ভদ্র-সমাজের কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করা এবং দেশ-বিদেশে জ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর মনের যোগ ঘটানো- -এই ছিল 'সবুজ পত্রে'র লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ এতে লেখক রূপে যোগ দিলেন। তাঁর পরিণত বয়সের অধিকাংশ বিখ্যাত লেখাই প্রকাশিত হয় এতে। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন --- 'সবুজপত্র' ছিল রবীন্দ্রনাথের কাগজ, আর তিনি ছিলেন তাঁরই নির্ব্বাচিত সম্পাদক। 'সবুজ পত্রে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-নাথের রচনার পরিমাণ লক্ষ্য করলে, এ কথা অসমীচীন মনে হয় না।

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির অব্যবহিত পর থেকেই কবির মনে ঘুরছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবন-নীতির সমগ্র পরিচায়ক একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান খোলবার পরিকল্পনা---যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সহজ ভাবে এসে মিশতে পারবে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও জানাজানির ভেতর দিয়ে। এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো কিছুদিন। সেইখান থেকেই স্তুরু তাঁর জীবনের সর্ব্বশেষ অধ্যায় -যে অধ্যায়ে বিশ্ব-মানবতার ভাব-বিগ্রহ রূপে তিনি জগদ্বিখ্যাত হন।

৪—

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা যখন দেশে-বিদেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় ভারতের জীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা দিলেন আর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ—তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিয়ে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পরিচালনা করে তিনি তখন যশস্বী হয়েছেন। ১৯১৫ সালে সস্ত্রীক মহাত্মাজী এলেন শান্তিনিকেতনে। নবা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই দুই সন্তানের মধ্যে এইখানেই সুরু হল বন্ধুত্ব, যা কবির জীবনকালে বরাবর অক্ষুন্ন থেকেছে। 'সবুজপত্রে'র কথা আমরা আগেই বলেছি—এতে এই সময় কবি লিখতে সুরু করলেন তাঁর বিখ্যাত 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস। এই দুটি বই, বিশেষতঃ 'ঘরে বাইরে' নিয়ে বাংলার সাহিত্য জগতে আবার বিরুদ্ধ আলোচনার ঝড় বইলো। প্রথমটিতে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার এবং দ্বিতীয়টিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটিগুলি কবি নির্ম্মমভাবে উদ্ঘাটিত করে দিলেন, যা অনেক সুবিধাবাদীর মনের মতো হল না। এ ছাড়া এই সময় তিনি 'বলাকা' কাব্য এবং 'ফাল্গুনী' নাটিকাও লিখলেন। ম্যাকমিলান কোম্পানী থেকেও তাঁর Gardener, Crescent Moon এই দুটি ইংরাজী কবিতার বই বেরুলো—Gardener 'ক্ষণিকা', 'চৈতালী' প্রভৃতি থেকে নির্ব্বাচিত কতকগুলি কবিতার সমষ্টি—আর Crescent Moon হল 'শিশু' কবিতাগুলির অনুবাদ-সংগ্রহ। 'চিত্রাঙ্গদা', 'ডাকঘর,' 'রাজা' প্রভৃতি নাটিকারও ইংরাজি

তর্জ্জমা এই সময় বেরুলো। এর মধ্যে Post Office ও King of the Dark Chamber কবির স্বকৃত অনুবাদ নয়।

১৯১৫ সালে গভর্ণমেণ্ট রবীন্দ্রনাথকে স্যার উপাধিতে সম্মানিত করলেন। সম্ভবতঃ স্বদেশী আন্দোলনে কবি যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন তা থেকে দেশের জন-মনে তাঁর প্রভাব কতটা বুঝতে পেরে গভর্ণমেণ্ট মনে করেছিলেন, সরকারী খেতাব দিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে খুশী করবেন। কিন্তু তাঁদের হিসাবে যে ভুল হয়েছিল সেটা অল্পদিন পরেই টের পাওয়া গেল। সে কথা আমরা পরে বলছি।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের আর একবার বিদেশ যাত্রার অবসর হল। তিনি পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজের সঙ্গে গেলেন জাপানে। জাপানে কবিকে যে ভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্বর্দ্ধিত করা হয়েছিল, তা বোধহয় জাপানের সম্রাট্ও কোনদিন পাননি। সভায়-সমিতিতে, প্রকাশ্যে, ঘরোয়া ভাবে জাপানের আপামর জন-সাধারণ কবিকে নিয়ে মেতে উঠেছিল। কিন্তু কবি যখন জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির এবং চীন সম্পর্কে অবলম্বিত শোষণ মূলক আচরণের তীব্র নিন্দা করলেন (তাঁর Nationalism বইয়ে এই বক্তৃতা গুলি গ্রথিত হয়েছে), তখন জাপানের সরকারী মনোভাব তাঁর প্রতি বিরূপ হল। কবি তখন জাপান থেকে রওনা হলেন আমেরিকায়। এখানেও চললো অনিষ্টকর জাতীয়তাবাদ, যা পর-রাজ্য গ্রাসের দ্বারা আত্মোন্নতির পথ খোঁজে,তার বিরুদ্ধে বক্তৃতার অভিযান। বৃটিশ ঘেঁষা মার্কিন মহল তাঁর এই বক্তৃতায় কুপিত

হল এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণও সুরু করে দিল। এই সময় 'হিন্দুস্থান গদর' নামে পরিচিত একটি আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী দলের নেতা রামচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে তীব্র অভিযোগ আনলেন। বৃটিশ সরকার প্রদত্ত স্যার উপাধির জয়পত্র কপালে এঁটে, তিনি ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্চেন শুধু করতালি লাভের জন্যে—আসলে তিনি ভারতে বৈদেশিক শাসন কায়েম রাখারই পক্ষপাতী, এই ছিল রামচন্দ্রের বক্তব্য। শুধু এই নয়, এই সময় প্রবল জনরব উঠেছিল যে গদর দল রবীন্দ্রনাথের প্রাণনাশ করবার সুযোগ খুঁজছে। রবীন্দ্রনাথ এ গুজবে বিশ্বাস করেন নি এবং রামচন্দ্রও লিখিত ভাবে এর প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু একটু উদ্যোগ হয়েছিল বলেই অনেকের বিশ্বাস।

অবশ্য আমেরিকার উদারনৈতিক সমাজে কবির সমাদরের অভাব হয়নি। নিউ ইয়র্ক এবং বষ্টনে তিনি বিশেষ ভাবেই সম্বর্দ্ধিত হয়েছেন এবং তাঁর বক্তৃতা লক্ষ লক্ষ লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছে। এই বক্তৃতাগুলিই Personality নামক বইয়ে স্থান পেয়েছে।

১৯১৭ সালে কবি দেশে ফিরলেন। ফেরার পথে হনললু হয়ে জাপানে আর একবার গেলেন কয়েক দিনের জন্যে। দেশে ফেরার পরই তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল আবার একটি ঝড়ের ভেতর। শ্রীযুক্তা আনি বেশান্তকে এই সময় গভর্ণমেণ্ট বিনা

বিচারে অন্তরীণ করলেন। এই মহীয়সী ভারত-বন্ধুর প্রা ত অনুষ্ঠিত অবিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে আলফ্রেড থিয়েটারে কবি তাঁর সর্ব্বজন পরিচিত রাজনৈতিক বক্তৃতা 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' পাঠ করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের অনুরোধে রচিত তাঁর ভারত বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটিও তিনি এই অনুষ্ঠানে গাইলেন। এই সময় কংগ্রেসের ভাবী অধিবেশনে সভানেত্রীরূপে প্রস্তাবিত হল শ্রীযুক্তা বেশান্তের নাম। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নরম পন্থীরা করলেন এর বিরোধিতা, রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্তা বেশান্তের মনীষা ও ত্যাগের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—তিনি শ্রীযুক্তা বেশান্তের পক্ষ সমর্থন করলেন এবং স্বয়ং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন। ইতিমধ্যে বিবাদের মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় এবং বেশান্ত মহোদয়া সভানেত্রী মনোনীতা হওয়ায় অবশ্য কবি আর সে পদ গ্রহণ করেন নি। কবি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন এবং 'ভারতের প্রার্থনা' কবিতা এখানে আবৃত্তি করেছিলেন। কংগ্রেস মণ্ডপে কবি প্রবেশ করা মাত্র যে উল্লাস তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল, তা অতুলনীয়। মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, পণ্ডিত মালবীয়, শ্রীযুক্তা বেশান্ত এবং কংগ্রেসের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গ কবির আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, এবং কবি নব প্রতিষ্ঠিত 'বিচিত্রা সাহিত্য-সভা'র পক্ষ থেকে তাঁদের আপ্যায়িত করেছিলেন 'ডাকঘরের' অভিনয় করে। এই সময় বিহারে হিন্দু-মুসলমানে একটা সংঘর্ষ হয়—তাতে কবির

লেখনী থেকে বের হয় তাঁর 'ছোট ও বড়' নামক রাজনৈতিক প্রবন্ধ।

১৯১৮ সালে আমেরিকা, জাপান ও ভারতবর্ষে বৃটিশ স্বার্থের বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পিয়ার্সন ধৃত হলেন এবং তাঁকে সরাসরি ইংলণ্ডে চালান করে দেওয়া হল। পিয়ার্সনের সঙ্গে সংস্রব থাকায় এবং আমেরিকা ও জাপানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মত প্রচারের দরুণ, রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের সম্পর্কেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব খুব অনুকূল হলনা। কবি তাতে একটু উদ্বিগ্ন হলেন, কিন্তু তাঁর উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি দমিত হল না। বরং অধিকতর উৎসাহেই তিনি বিশ্বভারতীর পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করবার চেস্টা করলেন। এই বৎসরেই বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল এবং পর বৎসর অর্থাৎ ১৯১৯ সালে জুলাই মাসে আন্তর্জ্জাতিক ভাব-বিনিময়ের এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চ্চার কেন্দ্ররূপে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ভাবে খোলা হল। কবি স্বয়ং নিলেন সাহিত্য বিভাগে পড়ানোর ভার। বিশ্ব-ভারতীর লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে কবি স্বয়ং বলেছেন—

"Visva-bharati represents India where she has her wealth of mind which is for all. Visva-bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best." অর্থাৎ, 'জগতের জন্যে ভারতের যা কিছু সম্পদ, বিশ্ব-ভারতী হবে

তারই প্রতিভূ। বিশ্বভারতী স্বীকার করবে সমস্ত পৃথিবীকে তার সাংস্কৃতিক আতিথ্যে সম্বর্দ্ধিত করতে এবং প্রতিদানে জগতের কাছ থেকে ভারতের পক্ষে গ্রহণীয় যা তা গ্রহণ করতে।'

ইতিমধ্যে পাঞ্জাব জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনায় ব্যথিত হয়ে বিশ্বমৈত্রীর শ্রেষ্ঠ পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ সরকার প্রদত্ত স্যার উপাধি পরিত্যাগ করলেন। এই উপলক্ষে বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে তিনি যে তেজোদ্দীপ্ত চিঠিখানি লিখেছিলেন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ আউরঙ্গজেবকে লেখা রাণা রাজসিংহের চিঠির সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এই তেজোগর্ভ চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে সাড়া পড়ে গেল।

পাঞ্জাবের এই হত্যাকাণ্ড সারা ভারতবর্ষে উদ্দীপনা সঞ্চার করলো, স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতায় ভগ্ন মেরুদণ্ড দেশ আবার জেগে উঠলো স্বাধীনতা লাভের জন্য। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, গোখেল, তিলকের রাজনীতি শেষ হয়েছিল, তার জায়গায় সুরু হল নূতন নেতৃত্ব, নূতন আন্দোলন। এই আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়ালেন এসে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহী বীর মহাত্মা গান্ধী, আর তাঁকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে এলেন মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ অসহযোগ আন্দোলনে মেতে উঠলো—ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ভারতবাসীর আত্মস্বতন্ত্র অধিকার অর্জ্জনের সেই

উদ্দাম আন্দোলন এক দিকে, অন্যদিকে তাকে নিরস্ত করবার জন্যে সরকারী হস্তের কঠোর নিপীড়ন। দেশ ডাকলো রবীন্দ্রনাথকে আর একবার তাঁর সেই অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়ে এই আন্দোলনে এসে দাঁড়াতে। মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে ধরে পড়লেন, কিন্তু কবি আর এলেন না।

চরকা, হরতাল ও অহিংসা নিয়ে গঠিত যে আন্দোলন এই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সুরু হল, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রক্ষণশীল নেতা তার ভেতর কোন বিশেষত্ব দেখতে পাননি। আত্ম-জীবনীতে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বরং বিদ্রূপই করেছেন এই আন্দোলনকে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়েছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবকের উদ্দীপনায় এবং সীমাবদ্ধও ছিল তাঁদেরই মধ্যে। দেশের আপামর জনসাধারণ সেই আহ্বানে সাড়া দেয়নি—ততখানি জন-চেতনা জন্মায়নি তখনও দেশে। তাই সে আন্দোলন অনুপায় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। গান্ধী-আন্দোলন সে হিসাবে অনেক বেশী ব্যাপক ছিল—দীনতম কৃষকটি থেকে সুরু করে মতিলাল নেহেরুর মতো বিত্তশালী ব্যক্তি পর্য্যন্ত এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সে হিসাবে ভারত-ইতিহাসে এই হল সত্যিকার প্রথম জাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলন যদি পেতো রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব, দেশের যে অবরুদ্ধ বেদনা আবর্ত্তিত হয়েছিল এর ভেতর দিয়ে, যদি তাকে তিনি ভাষা দিতেন! দুর্ভাগ্য বশতঃ কবি সেইখানেই থেমে থাকলেন।

—৫—

১৯২০ সালে পঞ্চম বারের জন্যে রবীন্দ্রনাথ বেরুলেন ইউরোপ সফরে। তাঁর স্যার উপাধি ত্যাগ ও সেই সঙ্গে ভারত শাসন ব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনা ব্রিটিশ বড় কর্ত্তাদের চোখে খুব প্রীতিপদ মনে হয়নি। কবি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, লণ্ডনে আর তাঁর আগের মতো সমাদর নেই। সেখান থেকে তিনি গেলেন ফ্রান্সে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে তিনি এক দিকে যেমন হলেন ব্যথিত, অন্যদিকে তেমনি যে মারাত্মক সাম্রাজ্য-লিপ্সা ও জাতি-দ্বেষ এই ধ্বংসের কারণ, তার ওপর হলেন আরও বীতশ্রদ্ধ। এই সময়ের কয়েকটি বক্তৃতায় তাঁর তৎকালীন মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ফ্রান্সেই তিনি বার্গসঁ, রলাঁ, সিলভাঁ লেভি প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যরথীদের সঙ্গে হলেন পরিচিত। ফ্রান্স থেকে গেলেন হল্যাণ্ডে—সেখানে তাঁকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ এবং ভগবান খ্রীষ্টের প্রতিভূ জ্ঞানে সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ নর নারী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শুনেছিল তার বাণী। হল্যাণ্ড থেকে বেলজিয়ামে গিয়েও তিনি একই রকম শ্রদ্ধা ও সমাদর আকর্ষণ করেছিলেন। স্বয়ং বেলজিয়মের রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান এবং তাঁর শোভা-যাত্রার অনুগমন করেন। হল্যাণ্ডে ও বেলজিয়ামে কবির বক্তৃতা শোনবার জন্যে যে রকম জন সমাবেশ হয়েছিল, তার নিদর্শন ইদানীন্তন ইউরোপে আর পাওয়া যায় নি।

ইউরোপ সফর অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই হঠাৎ কবি গেলেন আমেরিকায়। এখানে ছিলেন অতি অল্প দিন—এর ভেতরই ব্রুকলিন সঙ্গীত ভবনে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন' এবং নিউ-ইয়র্ক কার্ণেগী হলে 'কবির ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আমেরিকা থেকে আবার এলেন ইংলণ্ডে। সেখানকার আবহাওয়া তখনো সমান বিরূপ। আবার গেলেন প্যারিসে, এবং কয়েকটি বক্তৃতা করলেন। এর পর জার্ম্মাণী, সুইডেন, জেনেভা, আরো অনেক জায়গায়। জার্ম্মাণীতে তাঁর যে সমাদর হয়েছিল, তা পৃথিবীর কোন সম্রাটের ভাগ্যেও কখনো লাভ হয়নি। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং জার্ম্মান সরকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতিথি রূপে তাঁকে সসম্মানে রেখেছিলেন।

জগদ্বিখ্যাত আইনস্টাইন, ফ্রয়েড, টমাস ম্যান, কাইসারলিং প্রমুখ মনীষী এবং প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ, জেনারেল ম্যাসরিক, মঃ ক্লেমেনশ্য প্রমুখ রাষ্ট্রবিৎদের সঙ্গে তাঁর এইবারকার সফরেই সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। তাঁদের হাতে তিনি যে সম্মান পেয়েছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্মরণ করতেন! সুইডেনের নোবেল এ্যাকাডেমিতে, বার্লিন, প্রাগ, ভিয়েনা, ফ্রাঙ্কফোর্ট, কোপেনহেগেন, আরো কত জায়গাতেই যে তিনি গিয়েছেন এবং কত বিশ্ববিদ্যালয়েই যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার ধারাবাহিক ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। সর্ব্বত্রই তিনি পেয়েছেন বিপুল অভ্যর্থনা ও প্রভূত সমাদর। তাঁর এই

সময়কার ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস অবিলম্বে লিখিত হওয়া উচিত। কারণ এক হিসাবে এইবারকার পাশ্চাত্য ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে দিগ্বিজয়ের মতো।

১৯২১ সালের মাঝামাঝি কবি দেশে ফিরলেন। এইবার পূর্ণভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হল—আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল করলেন তার উদ্বোধনে পৌরহিত্য। ইতিমধ্যে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, মিঃ এলমহার্ষ্ট প্রভৃতি এসে যোগ দিলেন বিশ্ব ভারতীতে। শান্তিনিকেতনের অনতিদূরে অবস্থিত সুরুল গ্রামে লর্ড সিংহদের যে বাড়ীটি কবি আগে কিনেছিলেন, এলমহার্স্টের উদ্যোগে সেখানে স্থাপিত হল শ্রীনিকেতন শিল্প-বিদ্যালয়, আর অধ্যাপক লেভির চেষ্টায় শান্তিনিকেতনে চৈনিক ও তিব্বতী সংস্কৃতির চর্চ্চা আরম্ভ হল। ধীরে ধীরে বিশ্বভারতীর কর্ম্ম-কেন্দ্র নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে অল্পদিনেই এই আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন সম্পূর্ণ করলো। কবি তাঁর নোবেল প্রাইজের টাকা, বইয়ের আয়, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির যাবতীয় আয় সবই বিশ্বভারতীর ভাণ্ডারে দান করলেন।

কবি যখন ইউরোপে, তখন দেশে পূর্ণোদ্যমে চলছে গান্ধী-আন্দোলন। কবির অনুপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল এনড্রুজের হাতে—গান্ধী-ভক্ত এনড্রুজ কবির সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই শান্তিনিকেতনে আংশিক ভাবে গান্ধীবাদের প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করে বসলেন। দেশে ফিরে কবি আন্দোলন যে পথে চলছে তা অনুমোদন করতে পারলেন না—

কলকাতার এক জনসভায় তিনি এই আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করে তীব্র একটি বক্তৃতা দিলেন। 'শিক্ষার মিলন' নামক সেই বক্তৃতায় আন্তর্জ্জাতিকতার কাছে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাকে তিনি ছোট বলে প্রতিপন্ন করলেন। স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শিক্ষার বিরোধ' নামে এক বক্তৃতায় কবির প্রতিবাদ করলেন—সেই সঙ্গে করলেন তাঁর বিশ্ব-মৈত্রীর আদর্শকে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ। কবিও চুপ করে রইলেন না। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের আর এক বক্তৃতায় ('সত্যের আহ্বান') তিনি তাঁর মতের পুনরুক্তি করলেন। এবার জবাব দিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত গান্ধীজীর সেই 'Great Sentinel' প্রবন্ধ সর্ব্বজন পরিচিত।

এই কর্ম্মব্যস্ততার ভেতরেও কবির সাহিত্য-সাধনা কিন্তু পূর্ণোদ্যমেই চলছে। ইংরাজীতে বেরিয়েছে তাঁর 'জীবন স্মৃতি'র অনুবাদ, 'বিসর্জ্জন' এবং অন্যান্য নাটক-নাটিকার অনুবাদ, Personality, Nationalism প্রভৃতি বক্তৃতা সংগ্রহ এবং দু'খানি গল্প সঙ্কলন—Hungry Stones, Mashi & Other Stories। বাংলাতেও ইতিমধ্যে তিনি লিখেছেন 'পলাতকা', 'লিপিকা,' 'মুক্তধারা,' 'শিশু ভোলানাথ'। ১৯২২-১৯২৩ সালের বেশীর ভাগই কবির কাটলো ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণে। বোম্বাই, পুণা, মহীশূর, বাঙ্গালোর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মাদ্রাজ, কলম্বো, করাচি, হায়দারাবাদ, কাথিয়াবাড়···নানা স্থানে তিনি

বক্তৃতা দিয়ে এবং বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করে বেড়ালেন। এই সময়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা তাঁর 'রক্তকরবী' রূপক নাট্য।

১৯২৪ সালে চীন সরকারের আমন্ত্রণে কবি আবার বেরুলেন বিদেশ যাত্রায়। চীনে তাঁর সমাদর ও অভ্যর্থনা প্রচুর হল। নব্য চীনের কোন কোন সম্প্রদায় প্রথমে তাঁকে প্রগতি-বিরোধী বলে মনে করেছিল, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শোনার পর তাদের মনোভাব গেল বদলিয়ে। নব্য চীনের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ডাঃ হু-সীর সঙ্গে এইখানেই তাঁর আলাপ এবং চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের যে আদর্শ আজ রূপ লাভ করেছে বিশ্ব-ভারতীতে, তার সূত্রপাতও এইখানে। সাংহাই, নানকিং, পিকিং নানাস্থান ঘুরে, ফেরার পথে কিছুদিন জাপানে কাটিয়ে কবি দেশে এলেন। বাংলার মেয়েদের সম্পর্কে এই সময় লর্ড লিটন যে অশিষ্ট উক্তি করেছিলেন, তার প্রতিবাদে তাঁর উদ্দেশে কবি একখানি খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন। অল্পদিন পরেই পেরু স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-উৎসবে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ এলো এবং কবি দক্ষিণ আমেরিকায় রওনা হলেন। কিন্তু মাঝপথে অসুস্থ হয়ে তাঁকে বুয়েনস এরিসে নামতে হল। এই যাত্রার পথেই তিনি লিখলেন 'পূরবী'র কবিতাগুলি। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তিনি গেলেন ইতালীতে। জেনোয়া, ভেনিস, এবং মিলানে তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা সসম্মানে গৃহীত হন। কিন্তু হঠাৎ

অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে অল্পদিনেই দেশে ফিরে আসতে হয়। দেশে ফেরার অল্পদিন পরেই তাঁর কৈশোরের একান্ত প্রিয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেরও মৃত্যু হয় ঐ বৎসর (১৯২৫)। ১৯২৬ সালে কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই বৎসর কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং যৌবনের প্রিয় বন্ধু আগরতলা মহারাজের আতিথ্যে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই আবার এসে পৌঁছায় বিদেশের ডাক।

ইতিপূর্ব্বে শারীরিক অসুস্থতার জন্যে কবিকে ইতালীর সফর সংক্ষিপ্ত করে ফেলতে হয়েছিল, তাই ইতালিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে সিনর মুসোলিনী কবিকে আমন্ত্রণ করলেন। স্বয়ং মুসোলিনী, ইতালীর রাজা ভিক্টর, দার্শনিক ক্রোচে, অধ্যাপক বার্তুনি আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কবিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বক্তৃতা হয়—তাঁর নাটকের ইতালীয় অনুবাদ বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং ইতালীয় তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কবিকে মহা সমারোহে অভ্যর্থিত করা হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কবির ইতালী সফর অপ্রীতিকরতায় পর্য্যবসিত হয়। ইতালীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা কবির কাছ থেকে যে সমস্ত বিবৃতি নিয়েছিলেন, তাতে কবির মুখে ফ্যাসিস্ত ইতালীর শাসন-পদ্ধতির প্রশংসাত্মক অনেক কথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুইজারলণ্ডে এসে কবি এ সংবাদ জানতে পারেন এবং 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে' সুদীর্ঘ এক

পত্র পাঠিয়ে এর প্রতিবাদ করেন। ফ্যাসিস্ত ইতালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত উন্নতির প্রভূত প্রশংসা করেও যে হত্যা, নিপীড়ন ও অবাধ স্বৈরাচারের দ্বারা মুসোলিনী আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, কবি তার বিরুদ্ধে এই পত্রে কঠোর মন্তব্য করেন। ইতালীয়ান প্রেস এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং কবির উদ্দেশে যৎপরোনাস্তি কটূক্তি স্থরু করে দেয়।

সুইজারলণ্ডে কিছুদিন জর্জ্জ ডুহামেল ও রলাঁর আতিথ্যে কাটিয়ে কবি জুরিক যান। সেখান থেকে যান নরওয়েতে। নরওয়ের রাজা অসলোতে একটি বিরাট জন-সভায় তাঁকে সম্বৰ্দ্ধিত করলেন—বিয়র্ণসেন, জোহান বোয়ার, হ্যানসেন, ন্যুট হামসুন প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীরাও তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করলেন। ড্রেসডেন, কোলোন, বেলগ্রেড, সোফিয়া, বুখারেষ্ট, এথেন্স, কায়রো—এই যাত্রায় সর্ব্বত্রই তিনি বিপুল সম্মান ও গৌরবের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় তিনি রাজ-অতিথিরূপে গণ্য হয়েছিলেন এবং মিশরে যখন তিনি এসে পৌছান, তখন পার্লামেণ্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনও তাঁর সম্মানে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কবি দেশে পৌছালেন। ইতিমধ্যে তিনি লিখেছেন 'নটীর পূজা' নাটিকা, 'নটরাজ' গীতিনাট্য এবং 'যোগা-যোগ' উপন্যাস। এই বৎসর আগরা, জয়পুর, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন পরিভ্রমণ করে, তিনি আবার রওনা হলেন সুদূর-প্রাচ্য ভ্রমণে।

সিঙ্গাপুর, মালাক্কা, পিনাং, বাটাভিয়া, জাভা, বালীদ্বীপ—এই যাত্রায় তিনি সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং ওলন্দাজ, ইংরাজ, চৈনিক ও স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা মহা সমারোহে সম্বর্দ্ধিত হন। ফেরার পথে থাইল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণও রক্ষা করে এলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি যান মাদ্রাজ, পণ্ডিচারি ও সিংহলে। শ্রীযুক্তা আনিবেশান্ত এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এই বার তাঁর সাক্ষাৎ হয়। 'শেষের কবিতা' উপন্যাস এবং 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ তিনি লিখলেন এই আনাগোনার মুখে।

আবার তাঁর ডাক এলো সমুদ্র পার থেকে। কানাডা জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের ত্রিবার্ষিক সম্মিলনীতে যোগদান করতে। এইখানে তিনি Philosophy of Leisure সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড, কলোম্বিয়া এবং আরো কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার জন্যে আমন্ত্রণ এলো। লস এঞ্জেলস-এ পৌঁছিয়ে তাঁর পাশপোর্ট গেল হারিয়ে। তার ফলে মূর্খ এমিগ্রেশন্ অফিসারের হাতে তাঁর বিশেষ অবমাননা হয়—তার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েই কবি সমস্ত আমন্ত্রণ নাকচ করে সিধা জাপানে চলে এলেন। ফেরার পথে দিনকয়েক তিনি ইন্দোচীনে কাটালেন। এখানে ফরাসী গভর্ণমেণ্টও তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করলেন।

এই সময় থেকেই সুরু হয় কবির চিত্রাঙ্কন। তাঁর চিত্রাঙ্কনের ইতিহাস খুব বিচিত্র। কবিতা লিখতে লিখতে অনেক সময় পাণ্ডুলিপিতে যে সমস্ত কাটাকুটি হত, আপন খেয়ালে তার ওপর

কলম ঘষতে ঘষতে অজ্ঞাতসারেই গড়ে উঠতো এক-একটা ছবি —হঠাৎ কবি এটা লক্ষ্য করলেন এবং তখন থেকেই সজাগ ভাবে আরম্ভ করলেন ছবি আঁকা। ছবি আঁকার টেকনিক তিনি হাতে-কলমে কোনদিন শেখেন নি, দেহ-সংস্থান ও বর্ণ-সমাবেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রাথমিক জ্ঞান শিল্পবিদ্যালয়ে অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়, তাও করার সুযোগ হয়নি তাঁর। তাঁর কবি-প্রাণের অত্যুগ্র ভাবাবেশ রেখার ভাষায় আপন বেগেই উৎসারিত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত বিচারে তাতে ত্রুটি হয়ত আছে, কিন্তু আর্টের প্রাণবস্তু ও তার ব্যঞ্জনা তাঁর উৎকৃষ্ট ছবিতে পূর্ণরূপেই প্রকাশমান। দেশে ও বিদেশে বহু শিল্পী ও শিল্প-রসিকই কবির এই ছবিগুলির উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

১৯৩০ সালে আর একবার বেরুলেন তিনি ইউরোপ ভ্রমণে। মার্সেলিস, মন্টিকার্লো, চেকোশ্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা, নানাস্থানে এবার তাঁর ছবির প্রদর্শনী হল। ইউরোপীয় কলা-রসিকরা, বিশেষ করে ফরাসী সমালোচকরা, তাঁর ছবির প্রশংসায় শতমুখ হলেন। বিভিন্ন মিউজিয়ামে তাঁর ছবি সমাদরে গৃহীত হল এবং প্রসিদ্ধ সমালোচক হেনরি বিড্যো এই ছবির প্রসঙ্গে লিখলেন যে সাহিত্যিক ঠাকুর আর শিল্পী ঠাকুর আসলে এক সত্যদ্রষ্টা ঠাকুরেরই দুটি খণ্ড-অভিব্যক্তি, অখণ্ডরূপে তিনি এই দুই পরিচয়েরই অনেক ঊর্দ্ধে! লণ্ডনে এসে তিনি খবর পেলেন, মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং বাংলাদেশে প্রবলভাবে দমন-নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভারত শাসনে ব্রিটিশ-

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ

নীতির অদূরদর্শিতার আলোচনা করে তিনি 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে'র প্রতিনিধির কাছে একটি সতেজ বিবৃতি দিলেন। এই বৎসরই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হিবার্ট লেকচার দেন—সেই প্রসিদ্ধ বক্তৃতা পরে Religion of Man নামক পুস্তকে গ্রথিত হয়েছে। ইংলণ্ড থেকে তিনি জার্ম্মাণী গেলেন। মিউনিক এবং ড্রেসডেনেও তাঁর ছবির বিশেষ সমাদর হল। মোলারের আর্ট গ্যালারীতে তাঁর ছবির যে প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও চিত্র-সমালোচক কবির কৃতিত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন।

লণ্ডনে থাকতেই সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ থেকে মঃ লুনাচার্স্কি তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন। মস্কো পৌছিয়ে তিনি রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পোন্নয়ন বিভাগের বহু বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং তাঁদের দ্বারা বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হলেন। মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পাইওনিয়ার কম্যুন, রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন, নানা স্থানেই তাঁকে বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। মস্কো রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ামে তাঁর ছবির প্রদর্শনী বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে কৃতার্থ বোধ করেন। জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নোতি বিধান, তাঁদের মধ্যে শিক্ষা বিকীরণ, দারিদ্র্য ও সামাজিক অনৈক্য থেকে মুক্ত করে তাদের জীবনে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য আনা, শ্রমকে সম্মান ও শক্তিতে ভূষিত করা, আরো যে সমস্ত প্রয়াস সোভিয়েট রাশিয়াকে বিশ্ববরেণ্য

করেছে, কবি তা দেখে মুগ্ধ হলেন। তাঁর এই সময়ের অভিজ্ঞতা 'রাশিয়ার চিঠি' বইয়ে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। রাশিয়ার শাসনতন্ত্র ও নূতন সমাজ-বিধান এবং তাদের পরিপূরক বিধি-ব্যবস্থার প্রতি যে তাঁর খুব আস্থা ছিল তা নয়—তিনি অনুমোদন করেছিলেন তার জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানগুলিকে, কিন্তু যে বৈপ্লবিক কর্ম্ম-ধারার ভেতর দিয়ে রাশিয়া এই অনুষ্ঠান-গুলিকে সার্থক করেছে, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের খুব বেশী শ্রদ্ধা ছিল বলে মনে হয় না।

ফ্যাসিস্ত ইতালী ও নাৎসী জার্ম্মাণী প্রজার কল্যাণে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করেছে, কবি তাও সপ্রশংস অনুমোদনের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাদের আভ্যন্তরীণ শাসন-পদ্ধতি ও পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে কবি স্পষ্ট ভাষাতেই নিন্দা করেছেন। রাশিয়া সম্বন্ধে যদিও তাঁর এ রকম কোন সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ উক্তি প্রকাশ পায়নি, তবু সংরক্ষিত স্বার্থের বা ব্যবসায়িক, ভৌমিক ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের মূলোচ্ছেদ করে সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং একান্তভাবে শ্রমিক-রাষ্ট্রের করায়ত্ত নূতন রুশীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে তিনি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতেও পারেন নি। তাঁর বহু রচনাতেই তার প্রমাণ আছে। তিনি সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্ব-কল্যাণের দিক থেকেই রাশিয়াকে দেখেছিলেন—তার বেশী আর কিছু তাঁর মনের মতো ছিল না। মস্কো থেকে জার্ম্মাণী হয়ে তিনি গেলেন আমেরিকায়। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট হুভার তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ান

সোসায়েটিতে তাঁর সম্বর্দ্ধনায় বিরাট একটি ভোজ সভার অনুষ্ঠান হল। বোষ্টন এবং নিউইয়র্কে ছবির প্রদর্শনী সেরে তিনি এলেন ইংলণ্ডে। সেখান থেকে এলেন দেশে ফিরে।

১৯৩১ সালে কবির বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হল। এই উপ-লক্ষে সমস্ত দেশের পক্ষ থেকে তাঁকে 'জয়ন্তী উৎসবে' সম্বর্দ্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে বাংলার বিখ্যাত কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে অভিভাষণ, তার অনুলিপি এখানে দেওয়া হল—

'কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি, জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন, আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক। বাণীর দেউল আজ গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণ কল্পে দ্রব্য সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা, তোমার মধ্যে আজ সিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্য্য-গণকে তোমার অভিনন্দনের সঙ্গে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। হাত পাতিয়া জগতের

কাছে চাহিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক। হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকেও আজ নতশিরে বারংবার নমস্কার করি।'

এই উপলক্ষে বাংলার মনীষীবৃন্দের পক্ষ থেকে কবির জীবন ও সাহিত্য, সাধনা ও আদর্শ আলোচনা করে এবং কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রকাশিত হয়েছিল 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামক গ্রন্থ। বিশ্বের বিভিন্ন সভ্য দেশ থেকে বরেণ্য মনীষীরাও সকলেই পাঠিয়েছিলেন আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্ঘ্য—'Golden Book of Tagore' বইয়ে তা গ্রথিত হয়েছে। এই সময় কবি তাঁর সমগ্র জীবনের ব্রত ও সাধনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে, আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যে প্রত্যভিভাষণ দিয়েছিলেন, তাও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নীচে এই অভিভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

'অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্ব্বে, নানা অবস্থায়। সুরু করেছি কাঁচা বয়সে, তখন নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জ্জনীয় জিনিষ ভূরি ভূরি আছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে, আশা করি, তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের

পত্নী মৃণালিনী দেবী

সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে, একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্ম্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি, অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্ব্বদেশ, সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নর-দেবতা, তাঁরি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি। * * *

মর্ত্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ দান প্রীতি আমি পেয়েছি, একথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে—তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে, আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক। আর আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতি নিকটের, অতি পরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেছেন, তাঁদের সেই ভালোবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।'

—৬—

পঞ্চাশ থেকে সত্তর এই কুড়ি বৎসর হল রবীন্দ্রনাথের পরিব্রাজক জীবন। এই সময়ের ভেতর তিনি এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই একবার নয়, বার বার গেছেন, এবং জ্ঞানে-কর্ম্মে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছেন। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ এই কুড়ি বৎসরের জীবন তাঁর সীমাবদ্ধ দেশের ভেতর, এবং সে জীবন দেশের সমস্ত ক্ষেত্রকে পরিব্যাপ্ত করে। জমিদারী তদারক থেকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন দেশের জন সাধারণের বাস্তব অবস্থা, তাদের কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শোচনীয় দশা এবং তার উন্নয়নে একই সঙ্গে নিয়োগ করেছিলেন তাঁর লেখনী ও কর্ম্ম-শক্তি। পত্রিকা সম্পাদক রূপে সাহিত্যের সকল বিভাগকে তিনি একাই সমৃদ্ধ করেছিলেন নব নব অবদানে, এবং অনুবর্ত্তী লেখকবর্গকে উৎসাহিত করেছিলেন নব নব পথে লেখনী পরিচালনা করতে। গায়ক ও বক্তারূপে দেশের জন-মনে আশা, উদ্দীপনা ও জাগরণের সঞ্চার করেছিলেন, আবার রাজনীতিজ্ঞ রূপে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন— সমবায় সমিতি স্থাপন, স্বদেশী সমাজ গঠন, পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির শাসনে ম্রিয়মান জাতির মধ্যে আত্ম-চেতনা সঞ্চার, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে সম্মানিত করে তুলবার আন্দোলন, নানা পথেই

প্রবাহিত করেছিলেন তাঁর অসামান্য প্রতিভা। কংগ্রেস, বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষৎ, ব্রাহ্মসমাজ, এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাঁর সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না ছিলেন। এরই সঙ্গে পত্নী এবং পুত্র-কন্যাদের নিয়ে যথারীতি সংসার করেছেন— কন্যাদের যোগ্য পাত্রে বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে উচ্চ শিক্ষার্থ বিদেশে পাঠানো, পীড়িত পত্নীকে যথাবিধি সেবা করা, কোন কাজেই কোন ত্রুটি হয়নি তাঁর। তারপর করেছেন শান্তি নিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং স্বকীয় আদর্শে দেশের ভাবী বংশধরগণকে গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিয়েছেন স্বহস্তে।

এই বিশ বৎসর রবীন্দ্র-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মবহুল ও বহুমুখী অধ্যায়। যদি এই খানেই তাঁর জীবনান্ত হত, তাহলেও তিনি বাংলার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীরূপেই সর্ব্বজনপূজ্য হতেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য-বিধাতা তাঁকে বৃহত্তর সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন—তাই এই সময়ের মধ্যেই তাঁর তথাকথিত সংসার-বন্ধন গুলি একে একে শিথিল হয়ে গেল। একে একে দুটি পুত্র-কন্যা ও পত্নীর মৃত্যু হল, জ্যেষ্ঠ পুত্র মানুষ হয়ে গেলেন বিদেশে শিক্ষা লাভ করতে, অবশিষ্ট কন্যাটির হয়ে গেল বিবাহ, কবিও জমীদারী ছেড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে, স্বদেশী আন্দোলন ছেড়ে, সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবায়। বৈষয়িক আকর্ষণ-বিকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে, এখন থেকেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দিলেন তাঁর সাধনায়। শান্তিনিকেতন হল তাঁর সেই সাধনার প্রচার বেদী।

এই শান্তিনিকেতনই তাঁকে নিয়ে গিয়ে ফেললো বৃহত্তর জীবনের ভেতর। বাইরের পৃথিবী করলো তাঁকে আকর্ষণ এবং তিনিও বাইরের জগৎকে এনে কেন্দ্রীভূত করলেন এখানে—'যত্রবিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'।

পঞ্চাশ থেকে সত্তর এই বিশ বৎসর হল রবীন্দ্র-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং এক হিসাবে রবীন্দ্রেতিহাসের এইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়। এই সময়ের ভেতর তিনি বিশ্ব জয় করে বেড়িয়েছেন। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন, —'From continent to continent, country to country capital to capital, he has passed as a vision of light, East and West rendering him the obeisance due to a World-Teacher. It has been a royal progress and Rabindranath has moved like a king, a king of all hearts playing with wizard fingers upon the heart-strings of the nations. The great ones of the world have vied with one another in doing him all possible honour, learned and intellectual men have received him as a leader and the universities have opened wide their doors in scholastic welcome, men and women have jostled one another for a sight of this poet and prophet of the East.'

কবির এই গরিমাময় দিগ্বিজয়ের ইতিহাস আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করেছি,। এই গরিমা কবি শুধু নিজের জন্যে আহরণ করেন নি, সমস্ত ভারতবাসীর হয়েই তিনি বিশ্বের দরবারে করেছেন প্রতিনিধিত্ব এবং পরাধীন ও মর্য্যাদাহীন দেশকে চিরদিনের মতো বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় করেছেন। এই বিশ্ব-বিজয়ের ফসল তিনি এনে সঞ্চিত করেছেন তাঁর বিশ্ব-ভারতীতে, যেখানে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন প্রাচ্যের সমগ্র প্রাণকে এবং প্রতীচ্যের প্রাণ-ধারার সঙ্গে তার সংযোগ ঘটিয়েছেন। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, চীন, আমেরিকা—বহিঃপৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেশ থেকেই কবি, কর্ম্মী, ও শিক্ষা-নায়কেরা এসে মিলিত হয়েছেন কবির এই কর্ম্ম-কেন্দ্রে। এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন, লেভি, উইনটারনীজ, ফরমিচি, ওকাকুরা, তানয়ূন সান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশ্বভারতীর কর্ম্মীরূপে বিখ্যাত হয়েছেন। শ্রীনিকেতন শিল্পবিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়করূপে বিখ্যাত হয়েছেন এলমহার্ষ্ট। আরো কত গুণী, জ্ঞানী ও বরেণ্য অতিথিই যে এখানে এসেছেন, তার সীমা-সংখ্যা নেই।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বহির্মুখী কর্ম্ম-জীবনের এইখানেই শেষ। জয়ন্তী উৎসবের পর তিনি আর একবার মাত্র বাইরে বেরিয়েছেন। পারস্য থেকে রেজাশা পহলবী তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। সিরাজ, ইস্পাহান, তেহারাণ ঘুরে তিনি বোগদাদে ইরাকের রাজা ফৈজলের আতিথ্য গ্রহণ করেন। পারস্য এবং ইরাকে কবির জন্মোৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত

হয়, রাশি রাশি সুগন্ধী গোলাপে কবিকে সমাবৃত করে, গীতে বাদ্যে আবৃত্তিতে তাঁরা তাঁকে যে ভাবে সমাদৃত করেছিলেন, তার স্মৃতি সানন্দে কবি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর পারস্য ভ্রমণে। এর পর অবশিস্ট দশ বৎসর কবির অতিবাহিত হয়েছে শান্তিনিকেতনে এবং অনেকটা নিবিষ্ট সাধনাতেই। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ জীবন থেকে তাই বলে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন নি। যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে দেশ তাঁকে স্মরণ করেছে, সেখানেই তিনিও দিয়েছেন সাড়া। ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে কারাগারে মহাত্মা গান্ধী মৃত্যু-পণ অনশন সুরু করলে, কবি জারবেদা জেলে স্বয়ং উপস্থিত হন এবং তাঁর সাক্ষাতেই মহাত্মাজী অনশন ভঙ্গ করেন। ঐ বৎসরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হয়ে কমলা লেকচার দেন এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দেন স্যার কৃষ্ণস্বামী আয়ার বক্তৃতা। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়, নানা স্থান থেকেই তাঁর আমন্ত্রণ আসে, এবং সর্ব্বত্রই তিনি বক্তৃতা দেন ও বেশীর ভাগ স্থলেই তাঁকে সম্মানাত্মক ডক্টর অফ লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৩৩ সালে বোম্বাইয়ে, ১৯৩৪ সালে সিংহলে, ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাবে, ১৯৩৬ সালে দিল্লী, এলাহাবাদ ও পাটনায় তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ভ্রাম্যমান অভিনেতৃদের নিয়ে তাঁর 'শাপ মোচন' 'তাসের দেশ' প্রভৃতি নৃত্য-নাট্যের অভিনয় করান এবং সর্ব্বত্রই

প্রচুর সমাদর লাভ করেন। এই সমস্ত নাট্যাভিনয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর ধন-ভাণ্ডারের উন্নতি সাধনে বৃদ্ধ কবিকে নিয়োজিত দেখে, মহাত্মা গান্ধী ব্যথিত হন এবং তাঁর অনুরোধে জনৈক অজ্ঞাত-নামা ভদ্রলোক কবিকে ষাট হাজার টাকার একখানি চেক উপহার দেন।

বলা বাহুল্য কবি যে শুধু অর্থ সংগ্রহের জন্যেই এত ঘোরাফেরা করতেন তা নয়, তাঁর অন্তরেই ছিল তীব্র ভ্রমণের নেশা। তার ওপর সমস্ত ভারতই তাঁকে ডাকতো প্রতিনিয়ত, তাই পরিপূর্ণ বার্দ্ধক্যের প্রসন্ন অবকাশ তিনি লাভ করতে পারেন নি। আজ এখানে, কাল ওখানে, তাঁকে ছুটে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। অবশ্য শাখায়-পল্লবে বিশ্বভারতীয় কর্ম্মকাণ্ড দিনে দিনে যে রকম প্রসারিত হয়ে পড়ে, এবং ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের পরিমাণ আশানুরূপ না হওয়ায় তাতে কবিকে বিশেষ উদ্বিগ্নই হতে হয়। তাঁর এই সময়ের চিঠি-পত্রে এ উদ্বেগ অনেক বার প্রকাশও পেয়েছে। তা সত্ত্বেও যাঁরা কবির এই সমস্ত আভিনয়িক সফরকে বাণিজ্য বলে অভিহিত করেছেন এবং মহাকবির উদ্দেশে কটূক্তি করতেও কুণ্ঠিত হননি, তাঁদের আমরা সুবিবেচক মনে করতে পারিনা।

পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও কবির স্বাস্থ্য, স্মরণ-শক্তি এবং সাহিত্য-প্রতিভা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি একাদিক্রমে তখনও লিখে চলেছেন রাশি রাশি কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও নাটক-নাটিকা ইত্যাদি। ‘শাপ মোচন’ ও ‘তাসের দেশের’ কথা

আমরা আগেই বলেছি। এ ছাড়া 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ', 'কালের যাত্রা,' 'বাঁশরী,' 'চণ্ডালিকা', 'চার অধ্যায়', তাঁর শেষ জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট রচনাগুলি সবই লিখিত ও প্রকাশিত হয় তাঁর পঁচাত্তর বৎসর বয়সের মধ্যে। এ ছাড়া অজস্র ছবি আঁকেন তিনি এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কত যে প্রবন্ধ ও চিঠি-পত্র লেখেন, তার হিসাব দেওয়াই কঠিন। পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও এই রকম উদ্যম, কর্ম্ম-শক্তি এবং শিল্পসেবায় তন্ময়তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর যে কোন দেশেই দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ শুধু অসামান্য প্রতিভা নিয়েই জন্মাননি, তাঁর স্বাস্থ্যও ছিল অটুট। তাঁর নিজের ভাষায়, 'বার্দ্ধক্য তাঁর ওপরে শুভ্র একটি মোড়কের মতো হয়ে ভেতরের তাজা প্রাণকে চির-সজীব রেখেছিল'! আরো উল্লেখযোগ্য যে কবি এই বয়সেও সাহিত্যে নূতন নূতন পথ সন্ধান করেছেন, নূতন নূতন আদর্শের প্রবর্ত্তন করেছেন। গদ্য কবিতা, নৃত্যনাট্য, নূতন ধরণের ছড়া, বাংলা ভাষায় এনেছেন তিনিই এবং সে এই বয়সে।

চার অধ্যায় বইটি নিয়ে এদেশে কিছু হৈ-চৈ হয়েছিল। কিন্তু এই বইয়ের ভাষায় যে বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভঙ্গীর নিজস্বতা দেখা যায়, তা কারুরই দৃষ্টি এড়ায়নি। এমন কি অনেকের মতে চার অধ্যায়ই তাঁর শেষ বয়সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

১৯৩৭ সালে হঠাৎ কবির স্বাস্থ্যভঙ্গ হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতা সেরে কবি গিয়েছিলেন আলমোড়ায় গ্রীষ্ম যাপন করতে। সেখানে তিনি 'বিশ্ব পরিচয়'

নামক ক্ষুদ্র বিজ্ঞানের বইটি রচনা করেন। শান্তি নিকেতনে ফিরে কবি ব্যাপৃত ছিলেন বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজন নিয়ে, আকস্মিক ভাবে হলেন বিসর্প রোগে আক্রান্ত এবং কয়েকদিন সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন হয়ে রইলেন। সমস্ত দেশ ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়েছিল তাঁর জীবনান্তের আশঙ্কায়। সৌভাগ্য বশতঃ কবি সেরে উঠলেন—কিন্তু শরীর আর তাঁর ভালো হল না। স্বাধীন ভাবে চলাফেরা, সহজ ভাবে পরিশ্রম করা, তখন থেকেই তাঁকে আনতে হল কমিয়ে। অবশিস্ট যে ক'বছর বেঁচেছিলেন তিনি, সে সময়টা মোটের উপর শান্তিনিকেতনেই কাটিয়েছেন—শুধু গ্রীষ্মে একবার করে যেতেন কালিম্পং শৈলাবাসে, নয়ত পূজায় অন্য কোন স্থানে, আর মাঝে মাঝে আসতেন কলকাতায়। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রাসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট সাহিত্যব্রতীরা অনেকেই যেতেন তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নির্দ্দেশ গ্রহণ করতে, তাঁর বাণী শুনতে, তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। বার্দ্ধক্যের সেই অচঞ্চল প্রশান্তির মধ্যেও কিন্তু কবির লেখনার বিরাম ছিল না—রোগকালীন সংজ্ঞাহীনতার অনুভূতি নিয়ে তিনি লিখলেন 'প্রান্তিক' কবিতা গ্রন্থ, তারপর 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'সেঁজুতি', কবিতা পুস্তক এবং 'মুক্তির উপায়' নাটিকা।

উন-আশী বছরে কালিম্পং শৈলাবাসে থাকা কালে তিনি আর একবার গুরুতর ভাবে পীড়িত হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার্থ

তাঁকে কলকাতায় আনা হল এবং অল্পদিন পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে তিনি ফিরলেন শান্তিনিকেতনে। এর অল্প আগেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি-লিট উপাধিতে সম্মানিত করবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু বর্তমান মহাযুদ্ধ এবং শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কবির পক্ষে বাইরে যাওয়া অসম্ভব হওয়ায়, প্রতিনিধির সাহায্যে তাঁরা শান্তিনিকেতনেই অতিরিক্ত কনভোকেশনের ব্যবস্থা করিয়ে এই উপাধি বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে স্যার মরিস গায়ার এবং আচার্য্য সর্ব্বপল্লী রাধা-কৃষ্ণাণ অক্সফোর্ডের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। স্যার মরিস গায়ার এই অনুষ্ঠানে কবিকে অভিনন্দিত করেন ল্যাটিন ভাষায়, কবি প্রত্যভিনন্দন দেন সংস্কৃতে। যুদ্ধের হানাহানিতে সমস্ত জগৎ যখন উদ্ভ্রান্ত, বিশ্ব-শান্তির অগ্রদূত কবিকে তখনো বাড়ী এসে সম্মানিত করে যাওয়া এ যুগের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে, যেমন থাকবে প্যারিসের পতনের রাত্রেও বেতার যোগে তাঁর 'ডাকঘর' নাটকের ফরাসী অনুবাদ অভিনয় করা। দ্বিতীয় অসুস্থতার অল্প আগে কবি তাঁর প্রথম বয়সের ঘটনা নিয়ে ছোটদের উপযোগী করে 'ছেলেবেলা' নামে একটি আত্মকাহিনী লেখেন। এ ছাড়া রোগ মুক্তির পর প্রকাশিত হয় তাঁর আরো তিন খানি বই। 'রোগ শয্যায়' 'আরোগ্য', 'তিন সঙ্গী'—এর মধ্যে প্রথম দুটি কবিতার ও শেষটি গল্পের সংগ্রহ।

দ্বিতীয়বার অসুস্থতার পর থেকেই আস্তে আস্তে কবি

শয্যাশায়ী হয়ে পড়ছিলেন। উত্থান-শক্তি তার ছিলনা, নিদ্রা ও ও আহারের পরিমাণ কমে আসছিল, তার ওপর বার্দ্ধক্য জনিত বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিচ্ছিল। বাংলা ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে তাঁর বয়স আশী পূর্ণ হয়ে একাশীতে পড়লো---অন্যান্য বারের চেয়ে এবার অধিকতর সমারোহেই কবির জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু কবি আর সুস্থ ও সবল দেহে এতে যোগ দিতে পারেন নি। বিস্ময়ের কথা তাঁর মননশক্তি ও সাহিত্য-প্রতিভা তখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, নিজে হাতে তিনি তখন আর কলম ধরতে পারেন না, শুয়ে শুয়ে মুখে মুখে বলে যান এবং তাঁর আশে পাশের লোকেরা এগুলি লিখে যান। এই ভাবেই বৈশাখ মাসের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রদত্ত 'সভ্যতার সঙ্কট' নামক প্রসিদ্ধ অভিভাষণ রচিত হয়, 'জন্মদিন' নামক কাব্যগ্রন্থ এবং 'গল্প সল্প' নামক ছোটদের ছড়া ও গল্পের বইও রচিত হয়। এই তুটি বই-ই কবির শেষ রচনা। এরপর তিনি লিখেছেন মাত্র একটি তুটি প্রবন্ধ, নয়ত কবিতা কোন কোন সাময়িক পত্রে, আর লিখেছেন বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যা মিসেস রাথবোন ভারতবাসী সম্বন্ধে যে প্রতিকূল উক্তি করেছিলেন, তার প্রতিবাদে তাঁর সেই বিখ্যাত বিবৃতি। এরপর চিকিৎসার্থ তাঁকে আনা হল কলকাতায়। মূত্রগ্রন্থির বিকলতায় তিনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন—চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার ছাড়া এর আর কোন প্রতীকারের উপায় না দেখে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করলেন। ৩০শে জুলাই অপারেশন হয়। তাঁর ক্ষত প্রায় সেরেই এসেছিল

এবং চিকিৎসকগণ তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিশেষ আশঙ্কার লক্ষণও কিছু দেখতে পান নি। অনেকে আশা করেছিলেন যে হয়ত এবারও তিনি সেরে উঠবেন। কিন্তু পয়লা আগস্ট থেকে তাঁর নাড়ীর অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ে এবং উত্তরোত্তর অবস্থা অধিকতর খারাপই হয়ে আসতে থাকে। প্রায় তিনদিন সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন থাকার পর ৭ই (বাংলা ২২শে শ্রাবণ) বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ১৩ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি কারুকে কিছুই বলে যেতে পারেন নি। তাঁর কন্যা মীরা দেবী, পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এবং অপরাপর আত্মীয়বর্গ ও বহু অনুরাগীরা তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন, তাঁরা শুধু শুনেছেন সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে কবিকে মাত্র একবার বলতে, 'কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছিনে'! সেকি যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, অথবা বিশ্বভারতীয় ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে, অথবা আসন্ন মৃত্যুর মুখে নিজের অনিশ্চিত ভবিতব্য সম্বন্ধে উদ্বেগ? কে জানে শেষ মূহূর্তে মহাকবির অন্তরে আলোড়িত হয়েছিল কিসের দুর্ভাবনা!

অস্ত্রোপচারের দিন সন্ধ্যায় কবি একটি কবিতা মুখে মুখে রচনা করেছিলেন। তাতেও এই অনিশ্চয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে। সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হল—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি

বিচিত্র ছলনা জালে,

হে ছলনাময়ী

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে

সরল জীবনে।

এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত,

তার তরে রাখোনি গোপন রাত্রি।

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে

যে পথ দেখায়

সে যে তার অন্তরের পথ,

সে যে চিরস্বচ্ছ,

সহজ বিশ্বাস সে যে

করে তারে চিরসমুজ্জ্বল

বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু,

এই নিয়ে তাহার গৌরব।

লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।

সত্যেরে সে পায়

আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।

কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে

শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে

আপন ভাণ্ডারে।

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে

সে পায় তোমার হাতে

শান্তির অক্ষয় অধিকার।

কবির বরাবরই ইচ্ছা ছিল, তাঁর নিজে হাতে গড়া শান্তি-নিকেতনেই অনাড়ম্বরভাবে সম্পন্ন হবে তাঁর শেষ কৃত্য। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি বলেছিলেন যে জনগণের অভিপ্রায় অনুসারেই যেন একাজ করা হয়। তাই নিমতলা শ্মশান ঘাটে তাঁর পার্থিব দেহ নিয়ে যাওয়া হয় এবং কোটি কোটি শোকমগ্ন নর-নারী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর শবানুগমন করেন। তাঁদের চোখের সাম্নেই আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী, এযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির নশ্বর দেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে অনন্তে বিলীন হয়ে গেল।

শান্তিনিকেতনে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয় এবং যথাসম্ভব নিঃশব্দ শুচিতার সঙ্গেই সেই অনুষ্ঠান সমাধা হয়। মৃত্যুর কিছুদিন

আগে লেখা একটি গান কবি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে যান তাঁর শ্রাদ্ধ-বাসরে গীত হবার জন্যে। সেই গানটি এই—

সম্মুখে শান্তি পারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।

তুমি হবে চিরসাথী,
লহ লহ হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতি ধ্রুবতারকার॥

মুক্তিদাতা তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া,
হবে চির পাথেয় চিরযাত্রার॥

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার॥

কবির লোকান্তর প্রাপ্তির সংবাদে মহাত্মা গান্ধী কবিপুত্র রথীন্দ্র-নাথকে একটি সমবেদনা সূচক পত্রে জানান যে তাঁর সঙ্গে সমস্ত ভারতবাসীই পিতৃহীন হয়েছেন, কারা-প্রাচীরের অন্তরাল থেকে

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও এই কথারই প্রতিধ্বনি করেন। জীবন-মরণ যুদ্ধে আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকেও ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক ও ভাবুকরা তাঁদের প্রিয় কবির স্মৃতির উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিভিন্ন দেশে তাঁর স্মৃতি রক্ষার বিচিত্র ব্যবস্থাও হয়েছে ইতিমধ্যে।

— — c — -

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সাহিত্য

রবীন্দ্র সাহিত্য

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য আশানুরূপ সমাদর লাভ করেনি। এমন কি শিক্ষিত সমাজেও অনেকে জানেন না যে তিনি গদ্য রচনাতেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর একটা কারণ হয়ত এই যে বাংলাদশের মন ভারী জিনিষ নিতে অনিচ্ছুক—এছাড়া তাঁর কাব্য গ্রন্থাবলীর অত্যধিক প্রসার তাঁর বহু বিচিত্র গদ্য গ্রন্থাবলীকে কিছু পরিমাণে আড়াল করেও ফেলেছে। তাঁকে আমাদের দেশ জানে প্রধানতঃ কবি বলে, কিন্তু গ্যেটে বা ভিক্টর হুগোর মতো রবীন্দ্রনাথ গদ্যে বড় না পদ্যে বড়, তার সমাধান আজও হয়নি। তার গদ্যগ্রন্থাবলীর কিয়দংশ তাঁর কাব্য গ্রন্থাবলীর পরিপূরক সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্র নাথের বহুমুখী চিন্তা, বিচার বুদ্ধি ও মনীষার পরিচায়ক গদ্য সাহিত্যেরও যে একটা অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য আছে, একথা আজ প্রনিধান করার সময় এসেছে। কৈশোরে লেখা 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে স্নুরু করে, 'রাজা প্রজা,' 'শিক্ষা', 'আধুনিক সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'পঞ্চভূত', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'চারিত্র পূজা', 'জীবন স্মৃতি', 'শান্তিনিকেতন', 'লিপিকা', 'ছিন্নপত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'বিশ্বপরিচয়'—কত অসংখ্য গদ্য গ্রন্থই না তিনি লিখেছেন, এবং বিষয়ের দিক থেকে, দৃষ্টি ভঙ্গীর দিক থেকে, প্রকাশ রীতির দিক থেকে

তাদের নূতনত্ব, বৈচিত্র্য ও চমৎকারিতাই বা কত! গল্প উপন্যাস, কাব্য নাটক ও গান যদি তিনি আদৌ না লিখতেন, একমাত্র গদ্য গ্রন্থাবলীই তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের আসন দিত। তিনি যে রাস্কিন, এমার্সন, ম্যাথু আর্ণল্ড প্রভৃতির চেয়ে বড় গদ্য লেখক, সে কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা সুরু হয় 'ভারতীর' আমলে। প্রথম তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে দেখা দেন সমালোচক রূপে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হল 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিরুদ্ধে—তারই পরবর্ত্তী পরিণতি হল শকুন্তলা, রামায়ণ, কাব্যের উপেক্ষিতা, কাদম্বরী, রাজসিংহ। 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শন' দিয়ে তাঁর গদ্য রচনার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়—তখন তিনি দেখা দেন সংস্কারক রূপে। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, লৌকিক জীবনের সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে যুগের আদর্শে ঢেলে সাজার কাজে তিনি এই সময় নিয়োজিত করেন তাঁর লেখনী। 'শিক্ষার বাহন,' 'স্বদেশী সমাজ', 'বিলাসের ফাঁস' প্রভৃতি প্রসঙ্গাত্মক রচনার জন্ম এই সময়ে।

এর অল্প পরেই এল স্বদেশী আন্দোলন, তারই আবহাওয়ায় দেশকে নূতন পথে আপনার মুক্তির সন্ধান করার নির্দ্দেশও তিনি দিলেন গদ্য রচনার সাহায্যেই। 'কণ্ঠরোধ', 'রাজকুটুম্ব,' 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার জন্ম এই সময়ে। এই সমস্ত লেখায় বক্তব্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লেখ-

যোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ওদের আসল বৈশিষ্ট্য বিষয়ে নয়, ভঙ্গীতে। সাদৃশ্য আরোপ ও উপমা প্রয়োগের কৌশল, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও বক্রোক্তির কায়দা এগুলিকে প্রচলিত সম্পাদকীয় রচনার মতো সাময়িক হতে দেয়নি। যুক্তির ফাঁক হয়ত অনেক জায়গায় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু উক্তির বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা সর্ব্বত্র লক্ষনীয়। অর্থাৎ এরা সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ আশ্রয় করে লিখিত হয়েও স্থায়ী সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কথা এইখানে বলে রাখা দরকার। তিনি আলোচ্য বিষয়কে আশ্রয় করে দাঁড়ি ধরে হিসাবী লোকের মতো চুলচেরা বিচার করেন না, ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক প্রসঙ্গ সমাবেশ করে, শেষ-কালে সিদ্ধান্তেও উপনীত হন না। তাঁর সমালোচনা সম্যক আলোচনা নয়—তা অবলম্বিত বিষয়ের ওপর নূতন সৌন্দর্য্য আরোপ, বলা যেতে পারে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি। মূলে কি ছিল, আর কি ছিল না, তাঁর সমালোচনার প্রসঙ্গে সে কথা অপ্রাসঙ্গিক। তিনি যে দিক থেকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন, সেখানেই তাদের সার্থকতা। শকুন্তলা, কুমার সম্ভব বা ছেলে ভুলানো ছড়ার আলোচনায় তিনি ভালো করেই দেখিয়েছেন যে বিষয়বস্তু তাঁর সমালোচনার উপলক্ষ্য মাত্র, তাকে কেন্দ্র করে তাঁর সৃজনী মনই নানা সুরে কথা কয়। বলা যেতে পারে এর নাম রসাত্মক সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার তৃতীয় পর্য্যায় সুরু হয় ‘সবুজ

পত্রে'। তখন থেকে তাঁর রচনা তত্ত্বপ্রধান হয়ে চলেছে। এর আগে তাঁর রচনাভঙ্গী ছিল প্রধানতঃ ক্ল্যাসিক্যাল। অলঙ্করণে ও বিন্যাস-চাতুর্য্যে তা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক হলেও, তাতে গতির মন্থরতা আছে। তা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, যুক্তিকে অতিক্রম করে তা চলে যায় শব্দ-শিল্পের এলাকায়। তৃতীয় পর্য্যায়ে এসে তিনি এই রচনা পদ্ধতিকে পরিহার করলেন। পূর্ব্বের সেই কাব্যধর্ম্মী অলঙ্কারাঢ্য রীতির জায়গায় এখন তিনি অবলম্বন করলেন সতেজ ও সুস্পষ্ট কথ্য ভাষা—বাংলা গদ্যের ঐশ্বর্য্য বহুল নবযৌবন রূপান্তরিত হল পৌরুষপুষ্ট মধ্য বয়সে। তাঁর এই আমলের গদ্য রচনায় তীব্রতা আছে, তীক্ষ্ণতা আছে—কিন্তু শাণিত তরবারির মতো সতেজ দীপ্তিতে তা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বাংলা চলতি ক্রিয়াপদ, সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া বিশেষণে রচনার প্রাণশক্তি যে কতখানি সমৃদ্ধ হতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া গেল এই সময়ের রচনায়। কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা বাংলা দেশে সুরু হয়েছিল অনেক আগেই—একেবারে বিদ্যাসাগরের সময়ে। কিন্তু 'সবুজ পত্রে'র আগে তাকে শিষ্ট সাহিত্যের বাহন বলে কোনদিন মনে করা হয়নি। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', বা 'কলিকাতা কমলালয়' বা এই শ্রেণীর স্যাটায়ার রচনাতেই এর প্রয়োগ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম দেখালেন যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনাতেও এই বাহন সুষ্ঠুরূপে প্রয়োগ করা যেতে পারে, আর এ বিষয়ে তিনি পেলেন যোগ্য সহকারী প্রমথ চৌধুরীকে।

এঁরা দু-জনে বাংলা গদ্যের যে নূতন বিন্যাস পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাই ইদানীন্তন কালে সমস্ত লেখকের অবলম্বন স্বরূপ হয়েছে। এ হিসাবে এঁরা দু-জন, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, বাংলা গদ্য ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি দাতা।

রবীন্দ্র সমসাময়িক কালে বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যাঁরা গদ্য লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের সকলের উপরই অল্পাধিক রবীন্দ্র-প্রভাব দেখা গিয়ে থাকে। বিপিন পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রিয়-নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ রবীন্দ্র সমসাময়িক বিশিষ্ট গদ্যলেখক সকলেই মোটের ওপর রবি-প্রভাবান্বিত। কার্য্যতঃ এঁদের কেউ কেউ দলীয় আবর্ত্তে পড়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেও এঁদের রচনা রীতিই এটা ধরিয়ে দেয়। আর ইদানীন্তন কালের, যে কালের সূচনা প্রমথ চৌধুরী দিয়ে—সমস্ত লেখকই ষোল-আনা রবীন্দ্রিক। 'কল্লোল' 'কালিকলম' থেকে আজ পর্য্যন্ত যে নূতন লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা জীবননীতি ও মতবাদে রাবীন্দ্রিক আদর্শকে কেউ কেউ এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করলেও, শব্দচয়নে বা বিষয়-বিন্যাসে তাঁর প্রভাব আদৌ এড়াতে পারেননি।

আমরা আগেই বলেছি যে কবিরূপেই রবীন্দ্রনাথ এদেশে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাই সজাগভাবে আমরা করেছি তাঁর কাব্য

সাহিত্যের অনুশীলন। কিন্তু তাঁর গদ্য সাহিত্য অলক্ষ্যে আমাদের ভাব-প্রকাশের ও ভাষা-বিন্যাসের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে, তা আমরা ভালো করে টেরও পাইনি। সাম্প্রতিক সাহিত্যের পুঁজিপাটা আজ যাচাই করতে বসলেই বোঝা যায় যে কবির গদ্য রচনা আমাদের মনে কি গভীর শ্রদ্ধার আসন বিস্তার করেছে।

কবিতার পারম্পর্য্য ভাবাবেগের দিক থেকে, আর গদ্যের পাম্পর্য্য যুক্তি-শৃঙ্খলার দিক থেকে। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে দুইয়ের মিশ্রণও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা', 'ছিন্নপত্র' বা তাঁর 'শ্রাবণ সন্ধ্যা', 'কেকাধ্বনি' প্রভৃতি প্রবন্ধ আসলে গদ্যে লেখা কবিতা—আর 'রাশিয়ার চিঠি' হল খাঁটি জাতের প্রবন্ধ। অবশ্য গদ্য বলতেই যে কাটা-ছাঁটা কাজের কথা বোঝায়, যা ব্যবহৃত হয় আমাদের পাঠ্যপুস্তকে, নয়ত খবরের কাগজে, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই শ্রেণীর গদ্য কখনো লেখেননি। পাঠকের গোচরে বক্তব্য পেশ করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাঁর সাহিত্যে ভঙ্গীটাই প্রধান—তারই গুণে তাঁর হাতে সাময়িক প্রসঙ্গও যেমন স্থায়ী সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়, তেমনি গদ্যের বাঁধনে খাঁটি জাতের কাব্যও বাঁধা পড়ে।

নিছক কাজের কথা পূর্ণ বস্তুগত লেখার প্রাত্যহিক মূল্য যাই হক, সাহিত্যিক মূল্য বেশী নয়। পক্ষান্তরে অতি তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় জিনিসকে আশ্রয় করেও সাহিত্য সৃষ্ট হতে পারে। ইংরাজিতে ল্যাম্ব দেখিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে

ঠিক এই শ্রেণীর গদ্য রচনার পরিমাণ খুব বেশী নয়। আমাদের গদ্য সাহিত্য সূচনা থেকেই সিরীয়াস। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ লেখকেরা ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতির আলোচনাতেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ রেখেছেন তাঁদের রচনা। বলা বাহুল্য এই সমস্ত রচনা সমাজহিতে যা করেছে, তার মূল্য সমধিক। কিন্তু মনের রাশ আল্‌গা করে সহজ আনন্দে সাহিত্য পাঠ করার পুঁজি এঁদের রচনায় দুর্লভ। এমন কি বঙ্কিম-সাহিত্যেও নিছক সাহিত্যিক প্রবন্ধ নেই বললেই চলে। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একালে', সঞ্জীব চন্দ্রের 'পালামৌ'-এ, চন্দ্রনাথ বসুর 'একটি পাখী', 'পল্লীবাসের সুখ-দুঃখ' প্রভৃতি প্রবন্ধে ছিটে-ফোঁটা সাহিত্য-রসের আভাষ পাওয়া যায়, যাতে বিষয়ের চেয়ে ভঙ্গী বড়, বক্তব্যের চেয়ে বাচন কৌশল বড়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখেননি। তার কাবণ প্রবন্ধকার আমাদের দেশে থেকেছেন প্রধানতঃ শিক্ষকের আসন অধিকার করে, সহৃদয় বন্ধুর মতো পাঠকের কাছে নেমে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। 'পায়ে চলার পথ', 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' প্রভৃতি নিবন্ধে কবি এই যে একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেন, পরবর্ত্তী কালের লেখকরা এ থেকে প্রভূত প্রেরণা লাভ করেছেন।

এই শাখার অনুপূরক রূপেই উল্লেখযোগ্য কবির পত্রসাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী এবং আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলি। 'ছিন্নপত্র',

'ভানুসিংহের পত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে' প্রভৃতি পত্র-প্রবন্ধ, 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র', 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরি', 'জাপান যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি ভ্রমণ চিত্র এবং 'জীবন স্মৃতি', 'ছেলেবেলা' প্রভৃতি আত্মকাহিনী আদর্শ ব্যক্তিক রচনা হিসাবেই চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য। এই সমস্ত রচনায় আমরা পাই কবির নিজের মনের রং। দর্শনীয় ও চিন্তনীয় বিষয়গুলিকে তিনি এঁকেছেন ততটা বাস্তবের ওপর নজর না রেখে, যতটা নিজের মনের স্বপ্ন আরোপ করে। তাই তাঁর ভ্রমণে গন্তব্য স্থানটা বড় নয়, যাত্রা বড়, জীবন স্মৃতিতে স্মৃতি বড় নয়, জীবন বড়। তাঁর ধর্ম্মমূলক নিবন্ধ সংগ্রহ 'শান্তিনিকেতন'ও একই জাতের লেখা—তাতে ধর্ম্মের তত্ত্ব আছে এবং তার বিশ্লেষণও আছে, কিন্তু সে হল তাঁর নিজের সংজ্ঞা দিয়ে নিজের অনুভূতির ব্যাখ্যা। তাতে বিধি-বরাদ্দ ধর্ম্ম এবং তার বিচার-বিশ্লেষণ নেই—তাঁর স্বকীয় জীবন ও মননের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত অনুভূতি সত্য হয়ে উঠেছে, বাস্তবের সঙ্গে চিত্তবৃত্তির সজ্ঘাত থেকে যে বোধগুলি তুর্নিরীক্ষ্য ঐশী শক্তির অভিমুখে ধাবিত হয়েছে, তারই বিভিন্ন পর্য্যায় বিচিত্র সাহিত্য-রূপ লাভ করেছে। সেই জন্যে এগুলিকেও মোটের ওপর ব্যক্তিক রচনার শ্রেণীতেই ফেলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যে তাঁর ব্যক্তি-রূপ অনেকটা প্রচ্ছন্ন। তিনি একক অনুভূতিকে সার্ব্বভৌম অনুভূতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিতেই অভ্যস্ত—একের সমস্যাকে সমস্ত জগতের

সমস্যারূপে দাঁড় করানোই তাঁর পদ্ধতি। সেই জন্যে তাঁর কাব্যের আবেদন সাধারণতঃ অপৌষেয়—তাতে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার প্রত্যক্ষ ছাপ ততটা পাওয়া যায় না, যতটা যায় তাঁর গদ্য সাহিত্যে। আগেই বলেছি যে তাঁর গদ্য সাহিত্য কতকাংশে তাঁর কাব্য সাহিত্যের অনুপূরক। এর মানে এই যে তাঁর কাব্যে যে দৃষ্টি ও অনুভূতি দুরারোহ রসের স্তরে উন্নীত হয়ে সাধারণের প্রাত্যহিক নাগালের বাইরে গেছে, গদ্য সাহিত্যে সেই সূক্ষ্ম ও অনেক ক্ষেত্রে নিরুপাধিক অনুভূতিকে হাতে-কলমে উপস্থাপিত করেছেন—বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা তার মর্ম্ম সম্যক ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। এ সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে তাঁর কাব্য সাহিত্যের সমগ্র আবেদন জন-মনে কখনই পৌঁছাতো কি না, যদি না তার পেছনে তাঁর স্বকীয় গদ্য সাহিত্য ব্যাখ্যাতা রূপে উপস্থিত থাকতো।

তাঁর জীবনদেবতা বাদ, অভিব্যক্তি বাদ, বিশ্বমানবতা বাদ, প্রকৃতি, জীব ও পরমার্থের পারস্পরিক সংশ্রবকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত লীলাবাদ—এক কথায় রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্নিহিত যা কিছু তত্ত্ব, সবই ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন গদ্য গ্রন্থে। জীবন রহস্যের দিব্য রূপ যা, তারই মতো প্রত্যক্ষ রূপ যা, তারও নানা দিকের ব্যাখ্যা তাঁর গদ্য সাহিত্যে সুলভ। রাজনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি—এক কথায় মানব-সভ্যতার যা কিছু মৌলিক উপকরণ, তাকে তাঁর কাব্যে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করেই স্থান দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্কোচন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর

কাব্য-সৃষ্টির মূল উৎস সন্ধানের পথে বাধা জন্মায়। গদ্য সাহিত্যে এই দিক গুলির সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি, চিন্তা ও মতামতের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় বলেই ঐ ফাঁক সহজে পূরণ করা যায়। অর্থাৎ কবি ও ভাবুক রবীন্দ্রনাথের আড়ালে প্রচ্ছন্ন যে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সমগ্র পরিচয় নিহিত রয়েছে তাঁর গদ্য সাহিত্যে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গদ্য যে একান্তভাবে তাঁর কাব্যের মর্ম্মোদঘাটনেই নিঃশেষিত নয়, একথা আশা করি পাঠকেরা বুঝতে পেরেছেন। আত্মস্বতন্ত্র সাহিত্য হিসাবেও তা অপূর্ব্ব! কি রাজনীতিক আন্দোলনে, কি সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় সম্প্রতিক আলোচনায়, কি ছন্দ, অলঙ্কার বা বৈয়াকরণিক তত্ত্বের গবেষণায়, কি বিজ্ঞান, ইতিহাস বা দর্শনের প্রসঙ্গ বিশ্লেষণে—সর্ব্বত্রই তাঁর লেখনী রূপে-রসে অপূর্ব্বতা লাভ করেছে। সংক্ষেপে তাঁর গদ্য সাহিত্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রসঙ্গত্মক গদ্য, আর আত্মবীক্ষা সূচক গদ্য। পত্র সাহিত্য, ভ্রমণ, আত্ম-কাহিনী অথবা ধর্ম্ম-বাণী সংক্রান্ত বক্তৃতা ইত্যাদি পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে—যাতে পাওয়া যায় কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের ভাব-সত্ত্বার পরিচয়। আর প্রথম ভাগে পড়ে বাকী সমস্ত গদ্য গ্রন্থ, যাতে পাওয়া যায় কর্ম্মী, সংস্কারক ও ভাব-নায়ক রবীন্দ্রনাথের মনন ও চিন্তার পরিচয়। এক সঙ্গে এই দুই-ই ছিলেন তিনি। তাঁর কাব্য, গান, নাটক, উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য থেকে তাঁর এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য

তাঁর অপরাপর পর্য্যায়ের সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশী অনুশীলন ও অনুভাবনের যোগ্য। পৃথিবীতে যাঁরা কেবলমাত্র গদ্য লিখিয়ে রূপেই প্রসিদ্ধ, তাঁদের কারোর লেখাতেও এত বেশী বৈচিত্র্য, এত বেশী বৈশিষ্ট্য আছে কিনা সন্দেহ।

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য তত্ত্ববাহুল্যে একটু নীরস হয়ে পড়ছিল। কিন্তু গদ্য লেখায় তাঁর হাত ছিল অক্ষুণ্ণ। এমন কি এদিক থেকে তাঁর লেখনী অধিকতর তীক্ষ্ণ এবং মর্ম্মাভিমুখী হয়েছিল বলেই মনে হয়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লেখা 'ছেলেবেলা' বইয়ে অথবা শেষ রোগশয্যা থেকে লেখা 'সভ্যতার সঙ্কট' বক্তৃতায়, বা 'গল্পসল্প' নামক খোশগল্পের সংগ্রহে তাঁর লেখনীর যে ধার দেখা যায়, তা সত্যই বিস্ময়কর। ষোল বছর বয়সে তিনি লিখেছিলেন 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র'—তখনকার 'জলধর পটলী' আবহাওয়ায় প্রত্যহের ব্যবহারে অভ্যস্ত ঘরোয়া কথ্য ভাষা ব্যবহারের প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তিনিই জানতেন। কিন্তু এই ভাষায় দীপ্তি, সুষমা ও শক্তি ছিল অসাধারণ। এই বইটি থেকে এখানে একটু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—'হয়ত বুঝতে পারছ, কী কী মসলার সংযোগে বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে ইঙ্গ-বঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত করে লিখতে পারিনি। এতসব ছোটো ছোটো বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে যে সে সকল খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।'

এরপর তুলে দিচ্ছি একটু 'সভ্যতার সঙ্কট' থেকে, যা এক হিসাবে তাঁর সর্ব্বশেষ উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা। এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছরের—

'আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে।'

—২—

বাংলা দেশে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যে নাটকের সাফল্য পরীক্ষিত না হয়, সাধারণ্যে তার সমাদর হয় না। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্য এদেশে তেমন করে আদৃত হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভার একটি বৃহৎ অংশ রূপ পেয়েছে তাঁর নাট্য সাহিত্যে। প্রথম যৌবন থেকে সুরু করে একেবারে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তিনি অল্লাধিক কুড়িখানা নাটক লিখেছেন। দু-এক খানি ছাড়া তাঁর কোন নাটকই প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যোগ্য সমাদর লাভ করেনি—কিন্তু বাংলা নাট্য সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ যে সবিশেষ সমৃদ্ধ করেছেন, একথা রসিক পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর নাট্য সাহিত্য রসিক-সমাজেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, তাই সে

সম্বন্ধে এখনো কোন নির্ভরযোগ্য আলোচনার সূত্রপাত হয়নি। বলা বাহুল্য আমরা সেই অভাব পূরণে অগ্রসর হইনি, যাতে এদিকে বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তারই দু-একটি প্রাথমিক ইঙ্গিত দিয়ে রাখা আমাদের উদ্দেশ্য।

কবির বহু বিস্তৃত নাট্য সাহিত্যকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম ভাগে দ্বন্দ্ব নাট্য—যথা, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজারাণী', 'চিত্রাঙ্গদা', 'নটীরপূজা' ঃ দ্বিতীয়ভাগে রঙ্গনাট্য—যথা, 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ' (শেষ রক্ষা), 'শোধ বোধ', 'মুক্তির উপায়' ঃ তৃতীয় ভাগে রূপক নাট্য—যথা, 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা' ঃ চতুর্থভাগে গীতি নাট্য ও নৃত্য নাট্য—যথা, 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'ঋতু উৎসব', ইত্যাদি এবং 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি। এর মধ্যে 'নটীর পূজা' ভিন্ন সমস্ত দ্বন্দ্ব-নাট্যই এবং মুক্তির উপায় ছাড়া সমস্ত রঙ্গনাট্যই কবির যৌবনের লেখা। রূপক নাট্যের সবগুলিই লেখা তাঁর পঞ্চাশ বৎসরের পরে। আর গীতি-নাট্যের মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' প্রথম যৌবনের, 'ঋতু উৎসব'গুলি প্রৌঢ় বয়সের, এবং নৃত্য-নাট্যগুলি সমস্তই পূর্ণ বার্দ্ধক্যের রচনা। এ ছাড়া 'কাহিনী' গ্রন্থের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন,' 'নরকবাস', 'সতী', প্রভৃতি নাট্য কবিতা, এবং 'বিদায় অভিশাপ', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' আছে—

আর আছে 'ব্যঙ্গ কৌতুকে'র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহসনগুলি। সবশুদ্ধ জড়িয়ে এই হল রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্য। কবিতা, গান ও গদ্য রচনার তুলনায় যদিও নাট্য রচনা তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার একটি গৌণ দিক মাত্র, তবু এদিকেও তাঁর সৃষ্টির বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য যে-কোন প্রথম শ্রেণীর লেখকের অনুরূপ।

বাংলা সাহিত্যে অনেক নামজাদা নাট্যকার আছেন, রঙ্গালয়ে তাঁদের নাটকের বিশেষ আদরও আছে। কিন্তু নিছক সাহিত্য লক্ষণাক্রান্ত এবং একক অধ্যয়নে উপভোগ্য নাটক দুর্লভ। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক, অমৃতলালের সমাজিক রঙ্গনাট্য, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের বা রাজকৃষ্ণ রায়ের বা আরো কোন-কোন লেখকের বহু প্রশংসিত নাটকের পাশে 'বিসর্জ্জন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ' প্রভৃতি বই রেখে পড়লেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

সর্ব্বপ্রথম কয়েকখানি ট্র্যাজেডির প্রতিপাদ্য নিয়ে আগে অল্প একটু সমালোচনা করে দেখাই। চিরাচরিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের ওপর সন্দেহাকুল প্রশ্নের আবির্ভাবে 'বিসর্জ্জনে'র যে ট্র্যাজেডি, বা রূপ ও যৌবনের সাময়িক মদিরায় বিভ্রান্ত প্রেমের স্বপ্নভঙ্গে 'চিত্রাঙ্গদা'র যে ট্র্যাজেডি, অনন্যনির্ভর দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত হওয়ায় 'রাজা ও রাণী'র যে ট্র্যাজেডি, বা সন্ন্যাসের সংসার-নির্লিপ্ততার অন্তরালে মানবীয় হৃদয়দৌর্ব্বল্যের সহসা আবির্ভাবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র যে

ট্র্যাজেডি—বাংলা নাট্য সাহিত্যের সমগ্র ঐতিহ্যেই তার অনুরূপ ট্র্যাজেডি নেই। ওদের উৎস হচ্ছে ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিগুলির স্বাতন্ত্র্যও তাই বলে কম নয়। কোন বহির্ঘটনার ওপর নির্ভর করে তাঁর ট্রাজেডিগুলির প্রকাশ নয়—তাঁর ট্রাজেডিতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সঙ্ঘাত, যা বহির্ঘটনাকে প্রবাহিত করেছে স্ব স্ব পরিণতির অভিমুখে।

এই চার খানি নাট্যকাব্যের পাত্রপাত্রীরা সকলেই তাই কম-বেশী অব্যক্তিক। তারা সকলেই কবির মানস-মূর্ত্তির এক-একটি নিরুপাধিক প্রতিভূ স্বরূপ। অর্থাৎ তারা স্ব স্ব রূপে আত্মস্বতন্ত্র চরিত্র নয়, তাদের সকলেরই সত্তার মূল নিবদ্ধ রয়েছ কবির আত্মকেন্দ্রিক মনে। তারা কেউ কবির ভাব-দ্বন্দ্বের এ-দিক, কেউ ও-দিক—তাদের প্রসার ও পরিভ্রমণ কবিকে কেন্দ্র করে, দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নয়, কারণ দ্বন্দ্ব কবির, তাদের নয়। এই জন্যে খাঁটি জাতের নাটক হিসাবে বিসর্জ্জন, চিত্রাঙ্গদা, রাজা ও রাণী প্রভৃতির দাবী অবশ্যই কমে যায়।

কিন্তু কমেডিতে কবির নাটকীয় কৃতিত্ব সত্যিই অতুলনীয়। বাংলা ভাষায় কমেডি লেখা হয়েছে সাধারণতঃ কোন-না-কোন দেশাচারের সমালোচনা করার জন্যে। তাই তারা সংস্কারের সাম্প্রতিক লক্ষ্যের উর্দ্ধে উঠতে পেরেছে কদাচিৎ। কবির কমেডিগুলোতে কোন গুরুভার সমস্যা নেই—কোন তত্ত্ব-তথ্যের বালাই নেই। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ, 'গোড়ায় গলদে'র

গদাই এবং 'চিরকুমার সভা'র অক্ষয়, শান্তি প্রভৃতি কোন বাণীর বাহক নয়, বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি নয়, তারা নিজ নিজ খেয়াল, সংস্কার ও বেয়াড়া অভ্যাস নিয়ে সম্পূর্ণ এক-একটি রসের মানুষ। তাদের কথাবার্ত্তা, কাজ-কর্ম্ম, ভঙ্গী-রঙ্গী আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পটভূমি থেকে আহৃত, যদিও প্রাত্যহিকের মালিন্য নেই তাদের গায়ে। তারা নিজেদের দুঃখ-সুখের টানা-পোড়েনে নাটকীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, নিজেরা তারা জানেও না অন্যেরা তাদের আচরণে হাসছে। তাদের চরিত্রের মূল-সূত্র গুলি পাঠকের চোখে উদ্‌ঘাটিত করে কবি আড়াল থেকে যাদুকরের মতো তাদের নাচিয়ে গেছেন, তারাও ঘটনার স্রোতে নেচে চলেছে। অবশ্য চিরকুমার সভার হাস্যরসে তীক্ষ্ণতা একটু বেশী, সময় সময় সে হাসি চরিত্র বা ঘটনাকে ছেড়ে কেবল মাত্র শব্দকে আশ্রয় করে। কিন্তু গোড়ায় গলদ বা বৈকুণ্ঠের খাতা, বিশেষতঃ বৈকুণ্ঠের খাতা, সংযত, মার্জ্জিত ও প্রচ্ছন্ন হাস্যরসের আদর্শ রচনা। হয়ত সুরটা ওর একটু বেশী সূক্ষ্ম, মোটা কানের পক্ষে পরিমিত।

কিন্তু কবির তৃতীয় পর্য্যায়ের নাট্য গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম অভিমত। কেউ কেউ এগুলিকেই কবির সর্ব্বোত্তম রচনা বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর রূপক নাট্যগুলি আমরা ভালো রকম বুঝে উঠতে পারিনি। 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'ফাল্গুনী','ডাকঘর' প্রভৃতি পড়তে খুবই ভালো লাগে—এদের শাণিত তরবারির কসরতের মতো

উজ্জ্বল কথার খেলা চমক লাগায়। কিন্তু মনে হয়, রূপকের গহনে ওদের আখ্যানাংশের সূতায় মুহূর্তে মুহূর্তে জোট পাকিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত রূপকের ধারা অক্ষুন্ন থাকছে না, রূপকে ও প্রত্যক্ষে মেলামেশা হয়ে যাচ্ছে—চরিত্রগুলো হচ্ছে পূরোপূরি অবাস্তব, আখ্যাংশ শ্লথ গতি এবং প্রতিপাদ্য দুর্নিরীক্ষ্য। যে কোন সিদ্ধান্ত খাড়া করেই ওদের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে এবং অনেক গূঢ় রহস্যেরও আভাষ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে যা ধরা পড়েনা, তা খুঁজে বের করে রসোপলব্ধি সম্ভব নয় নিশ্চয়ই। অর্থাৎ কবির এই পর্য্যায়ের নাটক সর্ব্বসাধারণের জন্যে নয়। ওদের প্রাণ-বস্তু পর্য্যালোচনা করে আমরা কোন ধারাবাহিক বক্তব্যের হদিশ পাইনা। মেটারলিঙ্কের পদ্ধতিতে এই নাটকগুলো কবি লিখেছিলেন শুনেছি। মেটারলিঙ্ককে এ-দেশে এবং ও-দেশে সিম্বলিষ্ট বলা হয়ে থাকে—মেটারলিঙ্কের সাধারণ নাটকগুলি বিশেষ আনন্দের সঙ্গেই পড়া যায়, কিন্তু তাঁর সিম্বলিক নাটক আমাদের আদৌ বোধগম্য হয়নি। সিম্বলিজম বা যে-কোন ইজমই থাক তাদের ভেতর, তারা মোটেই সহজবোধ্য নয়। স্বয়ং টলষ্টয়ই তাদের অর্থ বের করতে হয়রান হয়ে গিয়ে শেষে অর্থহীন বলতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য সম্বন্ধেও আমরা অনুরূপ অভিমত জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হতে চাই। অবশ্য একথা আবার বলা দরকার যে বইগুলি পড়তে খুবই চমৎকার লাগে—কেমন একটা আবছা আবছা ব্যঞ্জনা, সব কিছুর সমবায়ে

কেমন একটা অন্তর্গূঢ় লিরিক-স্বপ্নের মতো লাগে এই সব নাটিকাগুলো।

তাঁর বার্দ্ধক্যের উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'তপতী', আর 'বাঁশরী'। এর মধ্যে তপতী পুরানো 'রাজা ও রাণী'র পুনর্লিখন এবং রাজা ও রাণীর কাব্যাত্মকতা এই নব রূপান্তরে খানিকটা নাটকীয় বৈশিষ্ট্যই লাভ করেছে। বাঁশরী ধারালো কথাবার্ত্তায় 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের জাত-ভাই—কিন্তু সাম্প্রতিক কালের কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট টাইপ নিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে এতে বিদ্রূপ করা হয়েছে মাত্র, তাদের ভেতর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন একটি ঘটনার পটভূমি গড়ে ওঠেনি। কবির লেখনী যে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, এই বই দুটিতে তা বিশেষ ভাবেই বোঝা যায়।

কবির সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ের নাট্য সাহিত্য নিয়ে বেশী কিছু বলার নেই। 'মায়ার খেলা' বা 'ঋতু উৎসব' আসলে গানের সংগ্রহ, নাটকের কাঠামো ওদের গানের মালায় সূতোর মতো থেকে, এক-একটা ঘটনার বা ব্যঞ্জনার ভেতর দিয়ে ওদের টেনে নিয়ে গিয়েছে। নিছক নাটক হিসাবে ওদের কোন দাবী নেই—ওরা দাবী করে কাব্য হিসাবেই। আর নৃত্য-নাট্যগুলি হল আসলে নৃত্যের পালা। তার মূক আভিনয়িক আবেদনকে দর্শকের মনের চোখে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই লেখা হয়েছে ওর গানগুলি—যা কথাবার্ত্তার মতোই স্বচ্ছন্দ, অথচ সুরসংবদ্ধ। এ জিনিষ বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং আমাদের রঙ্গালয়ের একঘেঁয়েমি দূর করার দিক থেকে এ সৃষ্টির মূল্য

বড় কম নয়। রবীন্দ্রনাথের লেখনী যে নিত্য কত নূতন পথে প্রবাহিত হত, শেষ ক'বৎসরের এই নৃত্য-নাট্য রচনা থেকেও তা প্রমাণিত হয়।

—৬—

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' যখন ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় বের হতে থাকে, তখন কবির বয়স বড় জোর ষোল সতেরো। এই বইটিকে কবি শেষও করেন নি, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশও করেন নি। এর কয়েক বৎসর পরে তিনি ভারতীতে লেখা সুরু করেন 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট'—এইটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। 'রাজর্ষি' হল এর পরবর্ত্তী বই। 'নৌকা ডুবি' এবং 'চোখের বালি' তাঁর যৌবনের রচনা—প্রৌঢ় বয়সে তিনি লেখেন 'গোরা', 'সবুজ পত্রে'র আমলে 'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ' এবং পূর্ণবার্দ্ধক্যের রচনা হল 'শেষের কবিতা' ও 'যোগাযোগ'। 'চার অধ্যায়', 'মালঞ্চ' ও 'দুই বোন' উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর সর্ব্বশেষ দান। 'নষ্টনীড়' 'গল্পগুচ্ছের' অন্তর্ভুক্ত রূপে প্রকাশিত হলেও তাও আসলে একটি উপন্যাস—বরং সে হিসাবে দুই বোন, মালঞ্চ প্রভৃতিই বড় গল্প। মোটের ওপর এই হল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎ চন্দ্রে এলে, আমরা বাংলা উপন্যাসের ক্রম পরিণতির একটি সমগ্র ইতিহাস পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা ভাষায় যা উপন্যাস হয়েছে, তা খাঁটি জাতের সাহিত্য নয়। বঙ্কিমই প্রথম

সত্যিকার সাহিত্যিক উপন্যাস লেখেন এবং নিজে যা লেখেন, তার চেয়ে অনেক বেশী পথ প্রস্তুত করে দিয়ে যান পরবর্ত্তী কালের লেখকদের জন্যে। রবীন্দ্রনাথে বঙ্কিম-সাহিত্যের সেই সম্ভাবনীয়তা পরিপূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাস গুলিতে বঙ্কিমের রচনা-ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। মধ্য বয়সে তিনি দৃষ্টি ও মনন রীতির গভীরতায় বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করে যান অনেক দূরে এবং শেষ জীবনে বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক চিন্তা-ধারার প্রবর্ত্তন করে বাংলা ভাষায় তিনি প্রথম প্রজ্ঞা মূলক উপন্যাসের সূত্রপাত করেন।

ক্রম-পরিণতি বোঝাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্যকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগের 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি উপন্যাসে কবির প্রধান উপজীব্য হল গল্প বলা। সেই গল্পকে মনোজ্ঞ করে বলার জন্যে যে তিনি আবহাওয়ার সৃষ্টি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবতারণা করেছেন, তাতে শিল্পীক কৃতিত্ব বিশেষ ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে, তবু অভিনিবেশ নিয়ে পড়লেই দেখা যাবে যে এই রচনা গুলিতে কবি সম্পুর্ণরূপে তাঁর মৌলিক পদ্ধতিটির সন্ধান পাননি—তিনি বঙ্কিমের কাঠামো অনুসরণ করেই লিখেছেন বইগুলি। অর্থাৎ এই বইগুলির ভেতর রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুরূপ সূক্ষ্ম মননশীলতা ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ততটা পাওয়া যায় না, যেমন পাওয়া যায় রচনার গাল্পিক কৌতূহলকে ঘটনার পর ঘটনা দিয়ে চমকপ্রদ করে গড়ে তোলার

কৌশলটি। এই বহির্মুখিতা ও গতানুগতিকতা যে তাঁর এই বই গুলির পক্ষে অসার্থক হয়েছে, কবি নিজেই তা টের পেয়ে ছিলেন—তাই পরে তিনি 'রাজর্ষির' বিষয়-বস্তু নিয়ে 'বিসর্জ্জন', এবং 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র বিষয়-বস্তু নিয়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লিখে প্রকারন্তরে এদের অস্বীকারই করেছিলেন। 'নৌকাডুবি' বইটি সম্বন্ধে তাঁর মমতা ছিল—সংগৃহীত রবীন্দ্র রচনাবলীতে এই বইটি সম্বন্ধে তিনি নূতন করে একটি ভূমিকা সংযোজিত করেন এবং তাতে যে মনস্তত্ত্ব সম্মত আদর্শে আজ উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে, নৌকাডুবি যে কেন তার অনুসরণে লিখিত হয়নি, তার তিনি একটি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য সে কৈফিয়ৎ মূলতঃ বঙ্কিমানুগমন। তবে এ কথা সুনিশ্চিত যে নৌকাডুবিই ঘটনা, চরিত্র এবং বিন্যাসের দিক থেকে রবীন্দ্র নাথের সর্ব্বপ্রথম বিশিষ্ট রচনা, যার ভূমিকা মাত্র দেখা যায় 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' বা 'রাজর্ষি'তে। বোধ হয় সেই জন্যেই কবি এই বইটিকে তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের Land-mark হিসাবে গণ্য করেছেন।

দ্বিতীয় ভাগের সুরু 'চোখের বালি'তে এবং 'গোরা'তে তার সম্পূর্ণতা। নিছক গল্প বলা পরিহার করে কবি এখন থেকে এলেন সমস্যা-বিচারে, এবং এই থেকেই বাংলা উপন্যাসের রাজ্যে এলো বিশ্লেষণমুখিতা। সমস্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও হাত দিয়েছিলেন, এবং 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যা নিয়েছিলেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তিনি সেই সমস্যারই সূত্রপাত করেছিলেন।

কিন্তু সমস্যাকে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা এবং কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিণতির নির্দ্দেশ দেওয়া বঙ্কিমের দ্বারা সম্ভব হয়নি, তার কারণ বঙ্কিম জীবনকে দেখেছিলেন প্রচলিত নীতি ও সমাজ ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক রূপে। তিনি দেখেছিলেন, বাল-বিধবা রোহিণীর স্বাভাবিক নিয়মেই পদস্খলন হয়েছে, কিন্তু তাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি, এমন কি সহানুভূতি দেখাতেও তাঁর আপত্তির অন্ত ছিল না। শিল্প-সৃষ্টি করতে বসেও তিনি ভুলতে পারেন নি যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থিত সমাজ-শৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণ ভার তাঁর হাতে ন্যস্ত। অর্থাৎ তিনি বাস্তবের আলোকে জীবনকে দেখেননি, মনস্তত্ত্ব সম্মত পথে তার বিচারও করেননি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম সেই সৎসাহস দেখালেন বিনোদিনীকে চিত্রিত করে। 'গোরা'তে তিনি জাতীয়তা বোধের স্বরূপ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন—এতে তিনি দেখিয়েছেন যে যে বিবেচনাহীন সংস্কারের অন্ধতায় আমরা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা নিয়ে মাতামাতি করি, অনেক সময়ই তার পিছনের বনিয়াদটার খবর আমাদের জানা থাকে না। আমরা কি ও কে, সেই খবর আমরা জানিনা বলেই পরজাতি বিদ্বেষের বাঁকা পথে আমরা স্বজাতির মুক্তি খুঁজতে বের হই। বাস্তবের অবস্থা-সঙ্ঘাতে যদি কোন দিন আকস্মিক ভাবেই বেরিয়ে পড়ে এই রূঢ় সত্যের কঙ্কালটি, তাহলে সেদিন আমরা বিশ্ব-মানবতার মধ্যে জাতীয়তাকে ডুবিয়ে না দিয়ে পারিনে। 'আনন্দ মঠে'র আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াতেই বোধহয় কবি লেখেন 'গোরা', যেমন

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রতিবাদেই লেখেন 'চোখের বালি'। প্রকৃত পক্ষে এই দুটিই হল রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। 'নষ্ট নীড়ে' বা 'চতুরঙ্গে' তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অধিকতর সূক্ষ্ম—অন্তঃপ্রবাহী মনস্তত্ত্বের আঘাত-সঙ্ঘাতে এদের ঘটনা ও চরিত্র অনেক বেশী সাবলীল গতিতে প্রসারিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে'তে পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সঙ্ঘাতে জীবনের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে অনেক বেশী গভীর ভাবে। তা সত্ত্বেও এগুলির ভেতর ঠিক সেই জাতের সম্পূর্ণতা নেই, বাস্তবের পরিপ্রেক্ষণীর ভেতর থেকে বিচিত্র জীবন-ধারাকে অনুভব করা ও তাকে পরস্পরের প্রতিকূলে উপস্থাপিত করে, সুস্পষ্ট এক-একটি জীবনাদর্শের নির্দ্দেশ দেওয়ার সেই সর্ব্বাঙ্গীনতা নেই, যা আছে 'চোখের বালি' ও 'গোরা'য়।

তৃতীয় ভাগের আরম্ভ 'ঘরে বাইরে'তে এবং 'চার অধ্যায়' পর্য্যন্ত চলেছে তারই জের। শুধু মাঝ খানে 'শেষের কবিতা' একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক নরনারীর চটুল ও বাস্তবসম্পর্কহীন জীবন নিয়ে কৌতুক করবার উদ্দেশ্যে কবি লিখেছিলেন এই রোমান্স খানি, এবং শিলংয়ের পার্ব্বত্য পটভূমিতে হাস্যে-লাস্যে কাব্যে-গানে এর খামখেয়ালী চরিত্র গুলো উৎসারিত হয়েছে এক-একটি কবিতার মতো। সমাজ জীবনের যে স্তরকে কবি লক্ষ্য করেছেন এই বইয়ে, 'বাঁশরী' নাটকেও তিনি এঁকেছেন তাদেরই—কিন্তু 'বাঁশরী'তে তাঁর বিদ্রূপের সুর তীক্ষ্ণ, 'শেষের কবিতা'য় তা

মন্দীভূত, রোমান্সের জৌলুষে আচ্ছন্ন। কবির অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃষ্ট এই সমস্ত অমিত ও লাবণ্যরা তাঁর সহানুভূতির ওপর চড়াও করে বসেছে, যার ফলে এ শ্রেণীর বাস্তববিমুখ আইডিয়া-সর্ব্বস্ব নরনারীর জীবন যে পরিণতির সম্মুখীন হতে পারতো, তা হয়নি। শাণিত কথার কসরতে এবং অনুপম কাব্য বিহ্বলতায় এর নরনারীরা উপভোগ্য, এবং সেই দিক থেকেই শেষের কবিতার মূল্য। তার অধিক এ থেকে কিছু প্রত্যাশা করা চলেনা।

তৃতীয় পর্ব্বে এসে রবীন্দ্রনাথ কথা-সাহিত্যের প্রচলিত প্রসিদ্ধি গুলোকে যথাসম্ভব এড়িয়ে গেলেন। কি গল্প বলায় আর কি মনস্তত্ত্ব বিচারে, কোন দিকেই এখন থেকে তাঁর আর সবিশেষ আস্থা রইলো না। এই পর্ব্বে তিনি প্রধানতঃ আশ্রয় করলেন তত্ত্বকে এবং তত্ত্বের বাহনরূপেই আসরে নামালেন নর-নারীকে। 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ'··· কোনটাই এদিক থেকে বিশুদ্ধ জাতের উপন্যাস নয়। এই পর্ব্বের 'যোগাযোগে' তাঁকে আর একবার অবশ্য পাওয়া গেছে পূর্ণাঙ্গ ঔপন্যাসিকরূপে—এই বইটিতে পর্য্যবেক্ষণ, ঘটনা সমাবেশ, চরিত্র চিত্রণ সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর লেখনীর নৈপুণ্য—তবু এ হল তাঁর সাহিত্যের নাবী ফসল, এখানে তাঁর সৃজনী প্রতিভায় সেই বেগ ও বিস্তার আর তেমন করে দেখা যায় না।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের এই তিন পর্ব্ব নিয়ে সমগ্রভাবে আলোচনা করলে, মোটা কথা এই দাঁড়ায় যে বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত

ধারার অনুসরণ করে কবি উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছিলেন এবং তাঁর স্বকীয় দৃষ্টি, চিন্তা ও মনশীলতার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে তা ধীরে ধীরে তার নিজস্ব পরিণতিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই পরিণতির স্বরূপ যদিও এত কম পরিসরে বোঝানো সম্ভব নয়, তবু সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বাস্তব বরাবরই থেকেছে পশ্চাৎপট রূপে, আর প্রত্যক্ষে যা ফুটেছে তা হল কবির ব্যক্তি-মনের ছায়া। তিনি যে নরনারীদের অবতারণা করেছেন তাঁর উপন্যাসে, তারা পুরোপুরি রক্ত-মাংসের মানুষ কেউই নয়, তারা হচ্ছে এক-একটি মানবায়িত ভাব। পরস্পর-বিরোধী ভাবের সঙ্ঘাতে রবীন্দ্র-উপন্যাসে তাই যে সমস্ত দ্বন্দ্ব তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, তা বস্তু-সংসারের প্রতিরূপ নয়।

আধুনিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে প্রাবন্ধিক উপন্যাসের রীতি নিয়ে পরীক্ষা চলছে, 'গোরা,' 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি বইয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা ভাষায় তার প্রবর্ত্তন করেন। নিছক উপন্যাস ঠিক নৌকাডুবিও নয়, এই দুটি বইও নয়, শেষের কবিতাও নয়। বরং নষ্টনীড় ও চতুরঙ্গে খাঁটি জাতের উপন্যাসের বীজ নিহিত আছে, যা স্বল্প পরিসরে গল্পাকারে সংহত করায় সমগ্র হয়ে রূপ নিতে পারেনি। মোটের ওপর উপন্যাস সাহিত্যের প্রচলিত প্রায় সমস্ত আদর্শ নিয়েই কবি পরীক্ষা করেছেন এবং আত্ম-স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি পরীক্ষাই তাঁর হাতে পূর্ণ সাফল্যলাভ করেছে, যদিও তথাকথিত প্রাবন্ধিক

উপন্যাসেই তাঁর লেখনী খুলেছে সবচেয়ে বেশী। এই নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দান। শরৎচন্দ্র থেকে আধুনিক কালের বিশিষ্ট উপন্যাসকাররা পর্য্যন্ত সকলেই অল্পবিস্তর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। যে যুক্তিসিদ্ধতা ও মননশীল আধুনিকতা ইদানীন্তন সমালোচনায় উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে সম্বর্দ্ধিত হয়, তার পেছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই আদর্শ। আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বস্তু-সংসারের বা বাস্তব নরনারীর পরিচয় অনেকটা প্রচ্ছন্ন। তাদের কেন্দ্র করে প্রধানতঃ ফুটে ওঠে রচয়িতার নিজস্ব মনন-ধারার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তিনি সেইটাকেই যাচিয়ে বাজিয়ে নেন। এই জন্যে এখনকার উপন্যাসে গল্পের পরিমাণ যেমন কম, চরিত্রের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য তেমনি সংহত। দোষের বা গুণের কথা না তুলেও বলা যেতে পারে যে এ একটি পদ্ধতি, যা এখনও পরীক্ষাধীন। রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষায় এর সূচনা করেছেন এবং তাঁর হাতেই এর পরিপূর্ণতা।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের এই অমানবিকতা শরৎচন্দ্রে এসে কতকটা বাস্তবানুগামী হয়েছে, বিষয় ও বিন্যাস দু-দিকে থেকেই তিনি যথাসম্ভব বস্তুকে আশ্রয় করে উপন্যাসের রস-সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মৌলিক প্রেরণা এবং তাকে শিল্পে রূপায়িত করবার বাহন তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকেই পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পাত্র-পাত্রীদের মতো তাঁর চরিত্রগুলি বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি নয়, দেশ-কালের অতীত সুমহান জীবন-ধর্ম্মকে আশ্রয়

করেও তারা চলে না, কিন্তু যে লৌকিক ব্যঞ্জনায় তারা পরিস্ফুট হয়েছে, তা মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথেরই অনুগামী। রবীন্দ্র-নাথে বাস্তব মানুষ নেই, এ কথা আগেই বলেছি, তবু যাদের তিনি মানুষ করে আসরে নামিয়েছেন, তারা সমাজ-সৌধের উঁচুতলার বাসিন্দাদেরই প্রতিচ্ছবি। বঙ্কিমের রাজা-জমিদার নাইট ও সন্ন্যাসীদের পর তারা স্পষ্ট ব্যতিক্রম সন্দেহ নেই, কিন্তু সাম্প্রতিক কালের আগে আমরা নিম্নবৃত্ত গৃহস্থ বাঙালীর চিত্র তেমন করে সাহিত্যে দেখিনি, এক দীনবন্ধু ছাড়া। রবীন্দ্র নাথের উপন্যাস সাহিত্যে সমাজ-জীবনের এই পর্য্যায়টির পরিচয় প্রচ্ছন্ন। এর কারণও সুস্পষ্ট। ভারতে বৈদেশিক শাসন প্রবর্ত্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল বৈদেশিক শিক্ষা ও ব্যবসা, আর এই দুইয়ের আকর্ষণে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অল্প সংখ্যক লোক এসেছিল নগরে—শিক্ষায় দীক্ষায় কাজে কারবারে আপনাদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বৈদেশিক প্রভুত্বের অনুপূরক আত্মস্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়রূপেই গড়ে উঠেছিল তারা। এক পুরুষ পরে দেশের গণ-জীবন থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে এরাই হয়ে পড়লো বাংলা দেশের তথাকথিত বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়—এরাই এ দেশে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি এক কথায় আধুনিক সংস্কৃতি গড়েছিল, তাই তার ভেতর স্থান হল না হীনবিত্ত কৃষক বা বৃত্তিজীবি পল্লীবাসীর। আর এক পুরুষ পরে ক্রমবর্দ্ধমান নাগরিকতার সঙ্গে ধনোৎপাদনের পরিমাণ অনুপাত রক্ষা করে চলতে না পারায়, সহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে ঢুকলো ভাঙন—

বেকার সমস্যা ও অবিবাহে বিপর্য্যস্ত হয়ে তার এক বৃহৎ অংশ দ্রুতগতিতে নেমে যেতে লাগলো গণ-জীবনের দিকে। এই হীনবিত্ত সহুরেরা শিক্ষিত, কাজেই বৃত্তিজীবি পল্লীবাসীর সঙ্গে এদের নাড়ীর যোগ নেই, আবার সম্পন্ন মধ্যবিত্তদের ভেতরও এরা স্থান পেলো না। এই অবস্থা-সঙ্কটে বাংলার সমাজ-জীবন আজ হয়ে রয়েছে বিশৃঙ্খল—কিন্তু আমাদের ভাব-জীবনে আজও অব্যাহত বেগে চলেছে বুর্জ্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব। তাই সাহিত্যের আসরে নিম্নবর্ত্তী স্তরগুলির আজও কোন ভাষা নেই।

রবীন্দ্রনাথ সম্পন্ন পরিবারে জন্মেছিলেন, স্বভাবধর্ম্মেই তিনি পেয়েছিলেন বুর্জ্জোয়া সংস্কৃতির অন্তঃপ্রেরণা, কাজেই সহানুভূতি ও কবিজনোচিত দরদের দৃষ্টিতে তিনি নিরন্ন পল্লী বাংলার দিকে মাঝে মাঝে তাকালেও, আসলে সে জীবন-ধারার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারেননি, যা কতকটা পেরেছিলেন শরৎচন্দ্র। কতকটা বলছি এই জন্যে যে বর্ণাশ্রমিক প্রভুত্ব ও শ্রেণী-চেতনা থেকে তিনিও ষোল-আনা মুক্ত হতে পারেন নি এবং সম্ভবতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনতিক্রমণীয় প্রভাবই সেজন্যে দায়ী।

অবশ্য শিল্পের বিচারে এটা খুব বড় কথা কিনা সন্দেহ। নিছক রস পরিবেষনের কাজে রঙের জৌলুষটা বাহুল্য নয়, হয়ত অপরিহার্য্যই। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাণ-ধর্ম্মী লেখকের ক্ষেত্রে। ভাষা-শিল্পের ও যুক্তিসিদ্ধ বিচার-তর্কের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন রূপে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্য চিরস্মরণীয়

হয়েছে, এইখানেই তার সত্যকার শ্রেষ্ঠতা। বাংলা সাহিত্যে আর কোন লেখকের এত বৈচিত্র্যময় উপন্যাস আছে?

—৪—

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা করবো। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম সমসাময়িক লেখকরা বাংলা উপন্যাসকে অনেকটা পূর্ণতা দিয়েছিলেন, কিন্তু ছোট গল্প রচনার দিকে রবীন্দ্রনাথের আগে কারুরই দৃষ্টি পড়েনি। কালীসিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক রহস্যে'র কতকগুলি রচনায় এবং কমলাকান্তের জবানবন্দীতে গল্পের ধাঁচা পাওয়া যায়, কিন্তু গল্পের সম্পূর্ণতা নেই। বঙ্কিমের 'যুগলাঙ্গুরীয়', দীনবন্ধু মিত্রের 'পোড়া মহেশ্বর', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', সঞ্জীব চন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ছোট আখ্যায়িকা—গল্প বলতে আজ আমরা যে শ্রেণীর রচনাকে বুঝি, এরা তা থেকে স্বতন্ত্র জাতের। বঙ্কিম-যুগে এই সমস্ত নক্সা, রঙ্গচিত্র ও ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাই সাদরে গৃহীত হয়েছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তন করলেন ছোট গল্পের এবং করলেন সম্পূর্ণ বৈদেশিক আদর্শে। প্রথমে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'তে, তারপর 'ভারতী'তে তিনি প্রকাশ করতে লাগলেন একের পর এক করে 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পমালা এবং তাঁর সমসাময়িকরাও তাঁরই দৃষ্টান্তে এই নূতন পথে লেখনী চালনার প্রবর্ত্তনা পেলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সুরেশ সমাজপতি, জলধর

সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের মেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও মূল ফরাসী থেকে মোপসাঁ, ব্যালজাক, জোলা, গতিয়ে, দোদে প্রভৃতির গল্প অনুবাদ করে দেশবাসীর সামনে মেলে ধরতে লাগলেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথের গল্প, অন্যদিকে বৈদেশিক শিল্পীদের গল্প একযোগে বাঙালীর রুচি-গঠনে যেমন সহায়তা করলো, তেমনি বাঙালী লেখককেও করলো প্রভূত পরিমাণে উৎসাহিত। আজকের দিনে বাংলা ছোট গল্প এমন একটা বিশিষ্ট জায়গায় এসেছে যে তাকে অনায়াসেই বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে স্থান দেওয়া যায়। কিন্তু তার আদি ইতিহাস সৃষ্টি করেন একক ভাবে রবীন্দ্রনাথ।

তিরিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী তদারকের ভার নিয়ে শিলাইদহে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। এই সময় জমিদারীর কাজে তাঁকে যেতে হয়েছে গ্রামে গ্রামে—কখনো নৌকায়, কখনো গরুর গাড়ীতে। এই সমস্ত আনাগোনার মুখে তিনি দেখেছেন পল্লীবাংলার ছবি, সুখে-দুঃখে তার নিত্য প্রবহমান জীবন তাঁকে মুগ্ধ করেছে। জমিদার রূপে এবং পরিদর্শক রূপে তিনি বিভিন্ন স্তরের লোকের সংস্রবে এসেছেন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র খুঁটিনাটি পড়েছে তাঁর চোখে। কবিসুলভ রোম্যান্টিক দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই জীবনকে চিত্রিত করেছেন কাব্যে ও গল্পে। তাঁর কাব্যের পটভূমি

রূপে পল্লীর আসনই সর্ব্বোচ্চে—তাঁর গল্পেও পল্লীই প্রধান অংশ নিয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'এক সময় আমি মাসের পর মাস পল্লী জীবনের গল্প রচনা করেছি। এর পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লী-জীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিলনা, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপ সিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামকে দেখেছিলেন রোম্যান্টিক দৃষ্টি দিয়ে—তার অপরিমেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পটভূমিতে নিবদ্ধ শান্তিপূর্ণ সংগ্রামহীন জীবনই তাঁকে করেছিল আকৃষ্ট। তাই কল্পনার পাখায় তিনি হাল্কা ভাবে উড়ে গেছেন সেই জীবনের ওপর দিয়ে—গভীর ভাবে তার ভেতর প্রবেশ করা তাঁর কবি-মনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' বা 'বামুনের মেয়ে'তে বা 'মহেশে' যে পল্লীর চিত্র আমরা পাই, তাতে রোমান্সের অবকাশ নাই। সে পল্লী নিরন্নতা, নৈতিক ও সামাজিক দৈন্য, দলাদলি, ঈর্ষা, অসূয়া ও নীচতার লীলাভূমি। বলা বাহুল্য তাই হল বাংলা পল্লীর আসল চেহারা—ফলভারা-নত বৃক্ষ, শস্যসমৃদ্ধ মাঠ, স্বচ্ছতোয়া নদী, শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন যাত্রা, শঙ্খ-ঘণ্টা মুখরিত সন্ধ্যা, বেণুরব বিমোহিত গোষ্ঠ-গৃহ আর যা-কিছু চলন্ত নৌকা বা ধাবমান রেলগাড়ী থেকে দেখা ও শোনা যায়, তাতে মাদকতা যাই থাকুক, বাস্তবে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে বাস্তবকে কল্পনার

অনুরঞ্জনে মধুর করে মনোজ্ঞ করে এঁকেছেন, তাই তাতে পল্লীগ্রামের প্রত্যক্ষ রূপ পরিস্ফুট হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যের প্রাণবস্তু বুঝতে হলে, এই জিনিসটিকেই মূল-সূত্র রূপে নিতে হবে। শুধু পল্লী জীবনের গল্পে কেন, সহুরে স্বল্পবিত্ত গৃহস্থদের জীবন নিয়ে তিনি যে সমস্ত গল্প লিখেছেন, তাতেও তাঁর পদ্ধতি একই। তিনি ওপর থেকে আলো ফেলে দেখেছেন, তাতে সব কিছুই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর নিজের আলোতে, কিন্তু সে উজ্জ্বল্য নেই বাস্তবে। অর্থাৎ তাঁর সমগ্র গল্প সাহিত্যই হল প্রধানতঃ কাব্যধর্ম্মী।

'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দুরাশা', 'মণিহারা' প্রভৃতি দূর-সংস্থিত রোমান্সের পটভূমিতে সংবদ্ধ গল্পে এই টেকনিক খুব চমৎকার ভাবেই খাপ খেয়েছে। তাতে কল্পনার যে বিস্তার, রসের যে ব্যাপকতা দেখা যায়, তা কবির প্রসিদ্ধ কবিতাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্ণনার চাতুর্য্যে, ভাষায় কারু-কার্য্যে, ভাবের ঐশ্বর্য্যে এই সমস্ত গল্প পরম উপভোগ্য। কিন্তু এই পদ্ধতিই যখন কবি প্রয়োগ কয়েছেন প্রত্যাহিক জীবনের গল্পে, যেমন 'মধ্যবর্ত্তিনী', 'নিশীথে', 'আপদ' প্রভৃতিতে, তখন বহিরঙ্গিক শিল্প-নৈপুণ্যের অসামান্যতা সত্ত্বেও গল্পগুলি ষোল-আনা সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। বাস্তবের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ কবি-কল্পনার মিশেল দিয়েই তৈরি করা হয়েছে এই সমস্ত গল্প। সুখে-দুঃখে আঘাতে-সজ্ঘাতে বয়ে চলেছে মানুষের যে দৈনন্দিন

জীবন, তার সঙ্গে এদের বন্ধনের গোড়াটা খুবই আল্গা। এরা ভেসে যায় মনের ওপর পর্দ্দা দিয়ে—খুব নীচু পর্য্যন্ত এদের শেকড় নেমে যায় না। এরা এক-একটা ভাবের গল্প —সত্য সংসার এদের উৎস, কিন্তু পরিণতির পথে এরা সংসারকে বহু পিছনে রেখেই ভেসে গেছে।

অবশ্য সব গল্প সম্বন্ধেই একথা নিখুঁত ভাবে প্রযোজ্য নয়। 'মেঘ ও রৌদ্র', 'কাবুলিওয়ালা', 'দিদি', 'হালদার গোষ্ঠী', 'একরাত্রি', 'পোষ্টমাষ্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' প্রভৃতি গল্প অনেকটাই দাঁড়িয়ে আছে বাস্তবের কাঠামোর ওপর। জীবন-দ্বন্দ্বের রসায়িত ব্যাখ্যান তাঁর এই গল্পগুলিরও অবলম্বন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই গল্পগুলিতে তাঁর পাত্র-পাত্রীরা আমাদের আশেপাশের মানুষদের পরিচিত চেহারাতেই দেখা দিয়েছে। তাদের যে সমস্ত আঘাত-সঙ্ঘাত, তা নিরুপাধিক ভাব-সঙ্ঘর্ষের লৌকিক রূপায়ন মাত্র নয়। এই গুলি সত্যিই মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প এবং এদিক থেকে এরা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব সৃষ্টি। বলা অনাবশ্যক যে তিনি এই ঐতিহ্য স্থাপন করে না গেলে, আজকের গল্প-সাহিত্য এত দ্রুত প্রসার লাভ করতো না। আর আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি এই সমস্ত গল্প লিখেছেন এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে—বাংলা সাহিত্যে তখনো চলছে বঙ্কিম-যুগ।

'হিতবাদী', 'বালক', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতির আমলেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ভালো গল্প বেরিয়েছে এবং মোটের

ওপর তাঁর ছোট গল্প রচনার যুগ এখানেই শেষ হয়ে যায়। প্রথমে অনেক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বের হয় তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' বই —পরে দু'খণ্ডে তাদের সময়ানুক্রমে সাজিয়ে গ্রথিত করা হয়েছে। এর পর 'সবুজপত্রে'র আমলে তিনি আবার গল্পের রাজ্যে এসেছিলেন—'চতুরঙ্গে'র প্রত্যেকটি পর্ব্বই প্রথমে আত্মস্বতন্ত্র গল্প-আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও অবশ্য ভেতরে-ভেতরে তাদের একের সঙ্গে অন্যের আত্মিক যোগ এমন ভাবে বজায় রাখা হয়েছিল, যাতে পরে তাদের সংযুক্ত করে সমগ্র একটি উপন্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। উপন্যাস-প্রসঙ্গে আমরা এই বইটির উল্লেখ করেছি—সুতরাং পুনরুক্তি করবো না। শুধু এই টুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই সময় যদি তিনি আর একবার অভিনিবেশ সহকারে গল্প লেখায় নামতেন, তাহলে বাংলা ভাষা আবার এক গুচ্ছ সত্যিকার ভালো গল্প পেতো।

এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। তাঁর গোড়ার দিককার গল্পে যে কাব্যিক মধুরতা সকলের চিত্তহরণ করেছিল, তার সঙ্গে খানিকটা তত্ত্বের খাদ মিশলে, গল্প কি রকম হতে পারতো, তার নিদর্শন হল 'জ্যাঠামশায়', 'শ্রীবিলাস', 'দামিনী'। দুর্ভাগ্য বশতঃ কবি এদিকে আর বেশী মন দেননি, দেশও তাঁর কাছ থেকে দাবী করে নূতন গল্প আদায় করে নিতে পারেনি। তার কারণ বোধহয়, বাংলা ভাষায় তখন গল্পের রাজ্যে দেখা দিয়েছেন শরৎচন্দ্র প্রমুখ লেখকরা।

বার্দ্ধক্যে কবি আর একবার হাত দিয়েছিলেন গল্প রচনায়। 'চার অধ্যায়', 'মালঞ্চ', 'দুই বোনে'র উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। কিন্তু এগুলিকে কবি উপন্যাস সংজ্ঞা দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন—এরা চলছেও উপন্যাস রূপেই। সুতরাং এদের নিয়ে আব পৃথকভাবে আলোচনা করবো না। এগুলির পর এই ধারার অনুসরণ করেই তিনি আরো তিনটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন—'ল্যাবরেটারী', 'রবিবার', 'ছোট গল্প', একত্রে গ্রথিত হয়ে যা 'তিন সঙ্গী' নামক বই হয়েছে। মৃত্যুর দু'মাস আগেও তিনি 'প্রবাসীতে' লিখেছিলেন একটি গল্প 'বদনাম' বলে। এই তাঁর সর্ব্বশেষ গল্প। এই গল্পগুলিতে কবির ভাষার ধার যেমন লক্ষনীয়, তেমনি লক্ষনীয় এদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে শাণিত যুক্তি-তর্কের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষিপ্রতা। কিন্তু এই ঔজ্জ্বল্য আর গতির বাইরে গল্পগুলিতে আর কিছুই বিশেষ পাওয়া যায় না—মনোধর্ম্মের সুগভীর আবেদন বা আখ্যানবস্তুর সুনিপুণ বিন্যাস ত নয়ই, এমন কি চরিত্রের সম্যক পূর্ণতাও এগুলিতে দেখা যায় না। এগুলি জোরালো লেখনীব লেখা, কিন্তু ক্লান্ত মনের ফসল, তাই সংহত হয়ে রস জমে উঠবার অবসর পায়নি এরা। বলার স্রোতেই কথা বয়ে গেছে, সেই গতির তলায় তলায় অলক্ষ্যে গল্পের পলিমৃত্তিকার স্তর গড়ে ওঠেনি। তবু এগুলি তাঁর শেষ গল্প রচনা হিসাবেই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এদের মধ্যে যে বৈচিত্র্য, নূতনত্ব ও কৃতিত্ব দেখা যায়, সেটুকুই বা কম কি ?

'সে' নামে তাঁর যে গল্প-সংগ্রহটি প্রকাশিত হয়েছিল ছোটদের জন্যে, তাতেও কতকগুলি ভালো লেখার সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু খাঁটি জাতের গল্প অপেক্ষা খোসগল্প রূপেই সেগুলোর বৈশিষ্ট্য। এরি উন্নততর রূপ হল তাঁর 'গল্পসল্প' বইয়ের লেখাগুলি। এই বইটি সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সর্ব্বশেষ দান—শেষ রোগশয্যা থেকে মুখে মুখে বলে তিনি লিখিয়েছিলেন এই বই —সেদিক থেকে এ একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। কিন্তু এও খোসগল্পের এলাকাতেই পড়ে, নিছক ছোটগল্পের আসরে এনে এর বিচার চলতে পারে না।

মোটের ওপর বাংলা ছোট গল্প রবীন্দ্রনাথই সুরু করেন এবং নিজেই তার বারো-আনা পূর্ণতা সাধন করে সে রাজ্য থেকে সরে যান—অন্যদের দ্বারা অধিকৃত হবার জন্যে। কিন্তু এই স্বল্পকালের ভেতরই তিনি গল্প যা লিখেছেন, সংখ্যায় তা অনেক আজীবন গল্প-লিখিয়ের পুঁজিপাটার সমান—আর নূতনত্বে বৈচিত্র্যে, শিল্পীক কৃতিত্বে তার বিস্ময়করতাও অসামান্য। যদি আগাগোড়া তিনি গল্প লেখায় নিরত থাকতেন, তাহলে তিনি কত বেশী গল্পই রেখে যেতে পারতেন! মোপাসাঁ, চেকভ, জুদারম্যান প্রমুখজগদ্বিখ্যাত গল্প লেখকের সঙ্গে এদিকেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে পারতো।

সবশেষে আর একটা কথা বলা দরকার। বাংলা সাহিত্যে আজ যে স্তরের ছোট গল্প লেখা হয়েছে, তা থেকে উজান হেঁটে রবীন্দ্রনাথের গল্পে গেলে, আমাদের চোখে স্বভাবতঃই একটা

জিনিষ ধরা পড়ে—তা হচ্ছে এই যে আমাদের গল্পের ধারা ও ধরণ আমূল বদলে গেছে। আজ আমরা লিরিক-প্রধান গল্পের রস গ্রহণ করতে পারি না. একক মনোধর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করেই আজ আমরা গল্পকে দেখি। বস্তু-বিন্যাসে কোথাও ফাঁক থাকলে, পারস্পরিক মনের খেলা যত নিখুঁত করেই দেখানো হক, আমাদের বিচারে গল্প আজ আর সার্থক সৃষ্টি হয়ে ওঠেনা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই সম্ভাবনীয়তার পথে আমাদের গল্প সাহিত্যকে এগিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথই এবং আজ পর্য্যন্ত গল্পের ভাষায় আমরা অনুসরণ করেছি শুধু তাঁকেই।

—৫—

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য নিয়ে সম্যক আলোচনা এত অল্প পরিসরে হওয়া সম্ভব নয়। আমরা মোটামুটি ভাবে তাঁর কাব্যের শ্রেণী বিভাগ ও প্রাথমিক পরিচয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। চোদ্দ-পনেরো বৎসর বয়স থেকে সুরু করে একেবারে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত তিনি যত কবিতা ও গান লিখেছেন, সংখ্যায় তা যেমন অপরিমিত, বৈচিত্র্যে তেমনি অসাধারণ। নাটক, উপন্যাস, গল্প. প্রবন্ধ-নিবন্ধ তিনি যা লিখেছেন, সব বাদ দিলে, এমন কি নাট্য কবিতাগুলি বাদ দিলেও, একমাত্র লিরিক কবিতা ও গানেই তিনি পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবির রেকর্ড ভঙ্গ করে গেছেন। লিরিক কবিতা কথাটি আমরা একটু ব্যাপক ভাবে নিয়েছি—রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যে যা কিছু দান, যথা চতুর্দ্দশপদী কবিতা (সনেট), আখ্যান

কবিতা, নীতি কবিতা, তত্ত্ব কবিতা, প্রেম কবিতা, রঙ্গ কবিতা, বর্ণনাত্মক কবিতা, ছন্দ-হিল্লোলের কবিতা, আত্মবীক্ষা সূচক কবিতা, ভগবদ্ভক্তি মূলক গান, মানবিক প্রেমের গান, প্রকৃতি সঙ্গীত—সব কিছুকেই আমরা এক হিসাবে লিরিক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি। নিছক রসাত্মক লিরিক বলতে যা বোঝায়, এদের কোন কোন বিভাগ তার বাইরে পড়ে সন্দেহ নেই, কারণ কবির নিজস্ব ভাবানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয়াত্মক রচনাকে লিরিক আখ্যা দেওয়া যায় না—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রাণ-ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই এমন সক্রিয় যে তাঁর একান্ত বস্তুগত রচনাতেও তাঁর ব্যক্তি-মনের ছায়া পড়েছে, কাজেই তাঁর সমুদয় কাব্য সাহিত্যকেই মোটা হিসাবে আমরা লিরিক শ্রেণীভুক্ত করতে পারি।

এই বহু শাখায় বিভক্ত কাব্যধারার সম্যক আলোচনা থেকে কবির দৃষ্টিভঙ্গী, মনন রীতি ও প্রকাশ-বিধির যে ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাতে বোঝা যায় যে একেবারে গোড়া থেকেই তিনি কয়েকটি নূতন সুর নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, যা দিনে দিনে বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে পরিপুষ্ট এবং সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে। এই নূতন দৃষ্টির পিছনে সমসাময়িক কালের বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কোন প্রভাবই ছিলনা। কবির বাল্যকালে এদেশে চলছে উপাখ্যান-কাব্যের যুগ, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিরা সেদিন দেশকে দেশাত্মবোধ, মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করার কাজেই তাঁদের লেখনী নিযুক্ত

করেছিলেন। একক মনের অনুভূতি—সুখে-দুঃখে আশায়-আশঙ্কায় নিত্য তরঙ্গিত জীবনের প্রাণ-স্পন্দন তাঁদের সাহিত্যে দুর্লভ। এই প্রাণ-ধর্ম্ম বর্জ্জিত বলেই তাঁদের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতিও প্রাণহীন, তাতে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সবই আছে, কিন্তু মানব-মনের সঙ্গে তাদের কোন অন্তরঙ্গ যোগ নেই—জীবনকে তাঁরা দেখেছিলেন কতকগুলি অনুষ্ঠানের সমষ্টিরূপে, প্রকৃতিকে তাঁরা দেখেছিলেন কতকগুলি উপকরণের আধার রূপে, তাই বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবাত্মার নিগূঢ় যোগকে আশ্রয় করে জন্মায় যে লিরিক কবিতা, তা লেখা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। 'সারদা মঙ্গলে'র কবি বিহারীল চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বপ্রথম এই দিক থেকে বাংলা কবিতার স্রোত ফিরালেন।

কবি বিহারীলালের দৃষ্টিতে নিজস্বতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে আত্মকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ঘূর্ণ্যমান নীহারিকার মতো নূতন সৃষ্টির আবেগে উচ্ছৃঙ্খল, অনেক স্থানেই তা সহিত হয়ে উঠতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলার বেগ এইখান থেকেই আহরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম প্রয়াসেই তিনি পূর্ণাঙ্গ কবির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র সূচনার কবিতাটিতেই এর আভাষ পাওয়া যায়—

সে গান না শোনে কেহ যদি
যদি তারা হারাইয়া যায়,
সন্ধ্যা তুই সযতনে গোপনে বিজনে অতি
ঢেকে দিস আঁধারের ছায়।

যেথায় পুরানো গান যেথায় হারানো হাসি
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেই খানে সযতনে রেখে দিস গানগুলি
রচে দিস সমাধি শয়ন।

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র যে 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন, সে এর ভেতর ভাবী রবির অরুণোদয় লক্ষ্য করেছিলেন বলেই। অবশ্য 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' বা এর অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'প্রভাত সঙ্গীত', 'কড়ি ও কোমল', 'ছবি ও গান' প্রভৃতি বইয়ে কাঁচা হাতের ছাপ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। প্রকাশের আকুলতায় কবির অন্তর উদ্বেলিত হচ্ছে, ভাষা ভাবের থৈ পাচ্ছেনা, এই রকমই বেশীর ভাগ কবিতা। সেই জন্যে কবি 'মানসী'র পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁর যা কিছু কবিতা, তাকে খাঁটি জাতের কাব্য বলে স্বীকার করতেন না। বলা বাহুল্য আমরাও তা করিনে। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর এই প্রাথমিক কবিতাগুলিতেও শোনা যায়—যা পরবর্ত্তী কালে অধিকতর সংহত হয়ে এসেছে। 'প্রভাত সঙ্গীতে'র—

পেয়েছি এত প্রাণ, যতোই করি দান,
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তা'রে—
আয় রে মেঘ আয়, বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যা রে।

কিংবা—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

অথবা 'কড়ি ও কোমলে'র—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য করে এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই!

কিংবা—

যাত্রা করি বৃথা যতো অহঙ্কার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা-দ্বেষ,
যাত্রা করি জ্যোতির্ম্ময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে,
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে—
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ-শোক।

অথবা—

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ,
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ,
যতো দেয় ততো পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যতো ফুল দেয় ধরা ততো ফুল পায় প্রতিদিন—
যতো প্রাণ ফুটাইছে ততোই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীন হীন,
অসীমে জগতে একি পিরীতির আদান-প্রদান।

বিশ্ব-প্রকৃতি, জীবন, ও মানব-সংসার সম্বন্ধে কবির যে সমস্ত মতবাদ সর্ব্বজন বিদিত, অপরিণত বয়সের এই অনুভূতির বীজ থেকেই পরবর্ত্তীকালে তা ফলে-পুষ্পে সমৃদ্ধ বনস্পতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সৌন্দর্য্য, বিশ্বকল্যাণ, প্রকৃতির ভেতর মানবিক সত্তার উপলব্ধি—এক কথায় রবীন্দ্র-কাব্যের মূল-সূত্র যা, সবই পাওয়া যায় এই সব কবিতায়। 'মানসী' থেকে তাঁর কাব্যের আঙ্গিক বিন্যাসে এসেছে বৈচিত্র্য, দৃষ্টির প্রসার বেড়েছে, তা হয়েছে অনেক বেশী অন্তর্মুখী, কিন্তু মৌলিক প্রকৃতিতে তা খুব বেশী বদলায় নি। আদি থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীর এই অক্ষুণ্ণ পারম্পর্য্য লক্ষ্য করেই স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্ত্তী কবির এই কাব্য-দৃষ্টির অন্তর্লগ্ন একটি মূল সুর আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন এবং 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবন দেবতা' বা 'চিত্রা' কবিতার ভেতর তার সন্ধান পান।

তাঁর মতে, জীবনদেবতাবাদই হল রবীন্দ্র-কাব্যের আসল সুর। আর সমস্ত সুরই হল তার অনুপূরক। এই জীবন দেবতাই হলেন কবির 'অসীম', 'চিরসুন্দর', 'লীলাসঙ্গী', তিনিই কবির 'তুমি'। তিনি কখনো কান্ত, কখনো রুদ্র, কখনো প্রকট, কখনো প্রচ্ছন্ন। কখনো তিনি গূহায়িত প্রাণ-শক্তি রূপে স্ফূর্ত্ত হচ্ছেন জগৎ-রহস্যের বিবিধ রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে, কখনো বা ধরা দিচ্ছেন সহজ হয়ে, প্রাত্যহিক জীবনের ছোট-বড় সমস্ত ব্যাপারের ভেতর দিয়ে। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতির গানে, 'ক্ষণিকা', 'চিত্রা', 'সোণার তরী' প্রভৃতির অনেক

প্রৌঢ় বয়সে রবীন্দ্রনাথ

(নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর)

কবিতায় এবং 'লিপিকা' প্রভৃতির কোন কোন প্রবন্ধে এই একই সুর, একই দৃষ্টি আবর্ত্তিত হয়েছে নানা ভাবে। 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' থেকে 'সোনার তরী' পর্য্যন্ত, 'সোনার তরী' থেকে 'মহুয়া' পর্য্যন্ত একটানা এই অনুভূতির খেলাই চলেছে। অজিত বাবুর এই জীবন-দেবতাকে ইয়েটস ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে 'ঈশ্বর' বলেই গ্রহণ করেছেন—কেউ কেউ এঁকে কবির মানসী বা কাব্য-লক্ষ্মী বলেও বুঝিয়েছেন। বস্তুতঃ অনেক কিছুই আরোপিত হয়েছে এই 'তুমি'র ওপর।

আবার আর এক দল বলেছেন, সৃষ্টি-মূলক অভিব্যক্তির (Creative evolution) অন্তর্লগ্ন গতিবাদই হল তাঁর কাব্যের মূল সুর—'বলাকা' কাব্যের 'নদী' কবিতায় এসে তাঁর এই গতিবাদ পূর্ণতা লাভ করেছে, কিন্তু 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' থেকেই চলেছে তার ধারা, যা 'মানস সুন্দরী', 'বসুন্ধরা', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'সোনার তরী' নানা কাব্যেই পাওয়া যায়। এই অভিব্যক্তির অন্তর্লগ্ন যে প্রাণ-সত্তা (Elan Vital), তাই হল কবির 'তুমি'—ইনি ঈশ্বর নন, কাব্য-লক্ষ্মী নন, ইনি বস্তুরই দিব্য শক্তি, যা জড় বিশ্বকে করেছে চৈতন্যময়, সসীমকে করেছে অসীমের সঙ্গে সংযুক্ত। রবীন্দ্র-কাব্য এঁদের মতে, এই ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ারই রসায়িত ব্যাখ্যান।

বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত ব্যাখ্যান রীতিমতো প্রাসঙ্গিক হলেও, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধেই এই শ্রেণী-নির্ণয় প্রযোজ্য হতে পারে না। কতকগুলো কবিতা আছে, যাদের প্রথম

দৃষ্টিতেই এদের এলাকার বাইরে বলে বোঝা যায়। 'কথা ও কাহিনী'র আখ্যান-কবিতা, 'কাহিনী'র নাট্য কবিতা, 'কণিকা'র নীতি কবিতা, 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথে'র শিশু কবিতা, 'পলাতকা'র গল্পকবিতা, 'নৈবেদ্যে'র ধর্ম্মমূলক ও দেশাত্মবোধক কবিতা, 'হিং টিং ছট', 'জুতা আবিষ্কার' প্রভৃতি হাসির কবিতা, এবং সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানব-জীবন ও বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কবিতা···যা রবীন্দ্র-কাব্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ, তা এই দার্শনিক জাতি-বিচারের গণ্ডীতে পড়ে না। শুধু তাঁর 'তুমি' মূলক কবিতা গুলি, যার ভেতর প্রেম কাব্য, প্রকৃতি কাব্য দুইই ধরা যায়, তাই নিয়েই চলতে পারে এ বিচার। সেদিক থেকে জীবন-দেবতাবাদই হক, আর গতি-বাদই হক, আর অন্য কোন দার্শনিক মতবাদই হক, কবির ওপর আরোপ করা যেতে পারে। অবশ্য এই জাতের কবিতা গুলোই হল খাঁটি লিরিক এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সমালোচকরা দাবীও করেছেন লিরিক কবিতা সম্বন্ধেই।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে যে কবিতা গুলোর উল্লেখ আমরা করেছি, তাও কবির লেখনীর by-product নয়, কোন একটা বিশেষ সময়ে বা অবস্থায় এদের তিনি পৃথক করেও লিখেন নি—তাঁর সমগ্র কাব্য-প্রবাহের ভেতর দিয়ে অন্যান্য শ্রেণীর কবিতার সঙ্গেই এরা উৎসারিত হয়ে এসেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-সংসার থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে পাশ্চাত্য দেশে

রবীন্দ্রনাথ খ্যাত Oriental Mystic (প্রাচ্যদেশীয় মরমী) রূপে, এদেশে তাই ইউরোপীয় সমালোচনার প্রতিধ্বনি করেই তাঁর কাব্য-সাহিত্যকে কোন-না-কোন একটা দার্শনিক অনুক্রমে বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে। তাই অনাবশ্যক ভাবেই অতিশয় সরল ও সহজবোধ্য রচনাকেও দার্শনিকতার আওতায় ফেলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে এবং যেখানে সামান্য একটু সুর বা ছোট একটি ছবি মাত্র কবি দিতে চেয়েছেন, সেখানেও জীবাত্মা পরমাত্মা সংক্রান্ত তত্ত্ব এনে হাজির করা হয়েছে। উপনিষদ, বার্গসেঁার দর্শন এবং আরো কত কি আরোপ করেই তাঁর কাব্যিক স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি সোনার তরীর গোড়ার কবিতা—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা,
কূলে একা আছি বসে নাহি ভরসা !
রাশি রাশি ভারা ভারা, ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা,
কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা।

এই কবিতার 'আমি' কে, 'ধান' কি, 'নদী' ও 'সোনার তরী' কার প্রতীক, তা নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছে প্রচুর এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থির হয়েছে যে জন্ম ও কর্ম্মফল ঘটিত রহস্যেরই এ একটি রূপক ব্যাখ্যান। কিন্তু আসলে এ যে সহজ একটি কবি-কল্পনা, যাতে স্বভাবোক্তির সঙ্গে ভাবানুভূতির যোগে মধুর একটি রসার্দ্রতা জমে উঠেছে, তার বেশী কিছুই নয়, একথা কারুরই মনে হয়

নি। 'বলাকা'র কবিতা গুলো সম্বন্ধেও একই বিপাক হয়েছে—যেহেতু তার কোন-কোনটায় তত্ত্ব আছে, সেই জন্যে তত্ত্ব-প্রচারকেই এই কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 'বলাকা', 'নদী', 'সাজাহান' সমস্ত কবিতাতেই কবির রস-কল্পনা যে বিচিত্র সৃষ্টির সম্ভার মেলে ধরেছে, তা Creative-evolution-এরই রূপক ব্যাখ্যান, কাব্যত্ব তাতে গৌণ, একথা রসিকের উক্তি নয়।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি—
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরু শ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ঐ শব্দরেখা ধরি চকিতে হইতে দিশেহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

প্রভৃতি অংশকে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব-জল্পনা থেকে বিশ্লিষ্ট করে নিলেও, নিছক কাব্য হিসাবেই সম্যকরূপে উপভোগ করা যায়। 'মহুয়া' কাব্যের কান্তাপ্রেমকেও অনুরূপ দার্শনিক ব্যঞ্জনা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে—তার লৌকিক কাঠামো এত

স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পণ্ডিত সমাজ এই কবিতাগুলির ওপর তত্ত্বের ছুরি চালাতে পেছপা হননি। তেমনি—

পথ বেঁধে দিল, বন্ধন হীন গ্রন্থি,
আমরা দু'জন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙীন নিমেষ ধূলার দুলাল,
পরাণে ছড়ায় আবির গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগাঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত!

অথবা—

বলো তারে বলো,
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণ শেষে, ছুঁয়ে ছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো।
বনের মন্দির মাঝে, তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের ওঠে স্তবগান।
চখে জল বয়ে যায়, নম্র হলো বন্দনায়,
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ॥

প্রভৃতি কবিতাও নিছক প্রেমের কবিতা, নর-নারীর বাস্তব অনুভূতিকে কেন্দ্র করে উৎসরিত যে প্রেম, তারি কবিতা, একথা আমরা সবিনয়ে নিবেদন করে রাখতে চাই। একজন বিদেশী লেখক বলেছেন, 'There is no stage of human thinking, no aspect of nature that does not

manifest in Rabindranath. Some times he is a mystic indeed, but oftentimes a sensuous observer, a lover and a critic.' আর একজন সমালোচকও বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দার্শনিক সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো যায় না, তিনি মানব-জীবনের প্রায় সমস্ত স্তরকেই স্পর্শ করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তাঁর দৃষ্টি ও মননশীলতা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। তিনি নিজের দেশ সম্পর্কে দেশ-প্রেমিক, আবার বহিঃপৃথিবী সম্পর্কে বিশ্ব-প্রেমিক, প্রেম সম্পর্কে তিনি আদর্শবাদী, কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষানুরাগী। শিশুর প্রতি তিনি দার্শনিক মনোভাব সম্পন্ন, নারীর প্রতি কান্ত-ভাবাপন্ন। ঈশ্বর সম্বন্ধে কখনো তিনি লীলাবাদী, কখনো পৌত্তলিক, কখনো বা নিরীশ্বর প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক। ব্যক্তি-সংস্রব-বিচ্ছিন্ন ভাব-জগৎ অনেক সময় তাঁর অবলম্বন, অনেক সময় দেহাতীত কল্পলোক তাঁর আশ্রয়, কখনো তিনি পলায়নপর, কখনো বিদ্রোহী, কখনো বা সংশয়ী। কখনো সংস্কারক রূপে প্রচলিত বিশ্ব-ব্যবস্থাকে তিনি ভেঙে তৈরী করতে চাইছেন, কখনো এর সুষমা ও সৌন্দর্য্যে আত্ম-নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছেন, কখনো আবার এ-সবের উর্দ্ধে উড়ে যাচ্ছেন স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে। এমন একজন সর্ব্বতোমুখী কবিকে আমরা শুধু মরমীয়াবাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ যেন না রাখি, কারণ সে হল তাঁর খণ্ড একটি পরিচয়।'

উদ্ধৃত অংশেই মোটামুটি ভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য

সাহিত্যের বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতার প্রাণ-পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। শুধু আর একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার। এই সব খণ্ড-অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে কবির যে অখণ্ড ভাব-রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে কোথাও পরস্পর-বিরোধিতা নেই, সমস্ত শাখা-নদীই উৎসারিত হয়েছে এক মহানদী থেকে, যার মূল রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্ত্বার স্বরূপ নির্ণয় বা তাঁর সৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্ণয় কঠিন হলেও হয়ত অসম্ভব নয়।

অন্য সব শ্রেণীর কবিতার কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা এখানে শুধু তাঁর আত্মকেন্দ্রিক লিরিক সম্বন্ধেই আর দু-একটি কথা বলবো। ব্যক্তিক রচনায় সাধারণতঃ কবির আত্ম-পরিচয় প্রচ্ছন্ন—সে কি গদ্যে আর কি পদ্যে। আত্মবীক্ষার আলোয় তাঁর লিরিক অনেক সময়ই উজ্জ্বল প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু সে আলো কবির ব্যক্তি-স্বরূপকে আশ্রয় করে ছড়িয়ে পড়ে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ব-মানবের ওপর। সেই বাস্তব-বিমুখ ভাবাত্মকতা তাঁর লিরিকের প্রধান লক্ষণ। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

হায় এমনি করে কি, ওগো চোর
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুম মোর
করি হৃদিতলে অবতরণ।
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষ-শোণিতে।

কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণী রণরণিতে।
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ।
আমি বুঝিনা যে কেন আসো যাও
ওগো মরণ হে মোর মরণ।

অথবা—

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি,
ভেবে দেখো মনে,
একদিন শত-বর্ষ আগে
চঞ্চল পুলক রাশি কোন স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্ম্মে আসি লাগে,
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধন হীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর,
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে,
তোমাদের শত-বর্ষ আগে।

সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে।
কত কথা পুষ্প প্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শত-বর্ষ আগে।
আজি হতে শত-বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি
তোমাদের ঘরে
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে,
হৃদয়-স্পন্দন তব ভ্রমর গুঞ্জনে নব
পল্লব মর্ম্মরে,
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

এই কবিতাংশগুলিতে বা এই জাতীয় অপরাপর কবিতায় ব্যক্তি-মনের স্থুর নেই তা নয়, কিন্তু সে কবির একক অনুভূতির স্থুর নয়, সমষ্টিগত ভাবে তা হল বিশ্ব-মানবের স্থুরের প্রতিধ্বনি। সময় সময় এই অব্যক্তিকতা তাঁর বিশিষ্ট লিরিক কবিতাগুলিকে অলঙ্করণের আতিশয্য ভারাক্রান্ত করেছে—নিছক প্রাণ-ধর্ম্মের বিচারে তাই সে সমস্ত কবিতা যথেষ্ট আন্তরিক হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন 'উর্ব্বশী'তে—

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী,
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশী।

আদি যুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার ?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন আঘাতে
বারি বিন্দুপাতে।

অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
রবে তরঙ্গিতে।

বৈদেশিক সমালোচকের মতে, 'চিত্রাঙ্কণ ও শব্দ-যোজনার অসামান্যতা সত্ত্বেও প্রাণ-বস্তুর ব্যাপারে এ কবিতা অনেকটাই প্রচলিত প্রসিদ্ধির অনুসরণ। কবির স্বকীয় অনুভূতি ও আনন্দ-বেদনার সৃষ্টি এ নয়।' বলা বাহুল্য এ মত আমরা স্বীকার করি না, তবে এই শ্রেণীর কবিতায় যে অলঙ্করণের চাতুর্য্যই বেশী এবং হৃদয়-ধর্ম্মের আবেদন যে কম, তা সুনিশ্চিত।

কবির অধিকাংশ প্রেম-কবিতায় এই অব্যক্তিকতা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন—

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হোলো যেন চিনি,
কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী।

কাজে ফেলে মোরে চলে গেছো কোন দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে,
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

অথবা—

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর আয়োজনহীন পরমাদ,
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ আলোকে এসো ধীরে ধীরে
বন-বেতসের বাঁশীতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ,
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
আসো নাই তুমি নব ফাল্গুনে ছিনু যবে তব ভরসায়,
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে
এ পরাণ ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায়—
আজি জলভরা বরষায়।

এমন কি পত্নী-বিয়োগের কবিতায়, যেখানে ব্যক্তি-মনের

ছায়া পড়া অনিবার্য্য ছিল, সেখানেও কবির দৃষ্টি গেছে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বমানবতার দিকে। যেমন—

যে-জন আজিকে ছেড়ে চলে গেল খুলি দ্বার
সেই বলে গেল ডাকি,
মোছো আঁখি জল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।
সেই বলে গেল, গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি,
নব-গৃহ মাঝে বহি এনো তুমি গৃহ-হীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি।

অবশ্য দু-একটি কবিতায় একক অন্তর্মুখিতার রেশ যে না পাওয়া যায় এমন নয়, কিন্তু তার পরিমাণ কম। মরণ-মহোৎসবের মধ্যে দিয়ে প্রিয়ার নব জন্মান্তর প্রাপ্তি এবং বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে অমর প্রাণ-লক্ষ্মীরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বাস্তব শোকের উর্দ্ধে। তাই এই সব শোক-কবিতায় শোকের প্রত্যক্ষ রূপ নেই, আছে তারি রসায়িত ব্যাখ্যান। যে দু-একটি কবিতার কথা বলেছি, তার একটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

তোমার বাহু কত না দিন শ্রান্তি-দুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি,
আজিকে তারে সকল তার কর্ম্ম হতে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি।

এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মন-প্রাণ,
এখন হতে আমার পূজা লহগো আঁখি সলিলে
আমার স্তব-গান।

এইখানে বলে রাখা দরকার যে ইউরোপীয় আদর্শে যে শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক লিরিক আমরা পড়তে অভ্যস্ত, সেই দিক থেকে বিচার করেই এই সমস্ত কবিতার অব্যক্তিকতাকে আমরা অপূর্ণতা বলে গণ্য করেছি। নচেৎ রসাত্মক কবিতা হিসাবে এদের অপূর্ব্বতা, বিচিত্রতা, শব্দ-প্রয়োগের অসামান্যতা কারুরই দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। ব্রাউনিঙের তীব্র ভাবাবেগ বা শেলীর নিবিড় আত্মকেন্দ্রিক থেকে যে লিরিক জন্মেছে, রবীন্দ্র-লিরিকে তার নিদর্শন নেই এমন নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ লোকত্তর রসের কবি, তাই লৌকিক পরিবেশের যে সমস্ত সজ্ঘাত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অনতিক্রম্য, তাকে তিনি স্বপ্নের রসায়নে রঞ্জিত বা তত্ত্বের পুটপাকে শোধিত করেই উপস্থাপিত করেছেন। এ একটা নূতন আদর্শ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এখানে রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা গুলিরও অল্প একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি। রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতায় 'বিষয়' শিশু, কিন্তু শিশুই সব সময়ে তার পাঠক নয়—পরিণত মনের দৃষ্টি, চিন্তা এবং অনুভূতির ছাপ তাদের ওপর সুস্পষ্ট। দু-একটা উদাহরণ দিই—

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্য কালের তুই পুরাতন
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,
তুই জগতের স্বপ্ন হোতে,
এসেছিস আনন্দ-স্রোতে
নূতন করে আমার বুকে বিলসি।

কিংবা—

জানলা থেকে তাকাই দূরে নীল আকাশের দিকে,
মনে হয়, মা আমার পানে চাইছে অনিমিখে।
কোলের পরে ধরে কবে দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে।

অবশ্য নিছক শিশুদের উপযোগী কবিতাও তিনি লিখেছেন অনেক। 'কাগজের নৌকা', 'খোকার বনবাস,' 'বীরপুরুষ' প্রভৃতি কে না পড়েছেন ? 'তালগাছ', 'নদী' প্রভৃতি কবিতাও ছেলে-বুড়ো সকলেরই সুপরিচিত। বৃদ্ধ বয়সে 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি' নামক বই দুটিতে তিনি নিছক শিশুদেরই কবিতা লিখেছেন অনেক। সেই—

খ্যান্ত বুড়ীর দিদি-শাশুড়ীর
তিন বোন থাকে কালনায়,
সাড়ী গুলো তারা উনানে বিছায়
হাঁড়ী গুলো রাখে আলনায়।

কোন দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে,
নিজে তারা থাকে লোহা সিন্ধুকে,
টাকা কড়ি গুলো হাওয়া পাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জালনায়।
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে,
চূন দেয় তারা ডালনায়।

নয়ত—

বর এসেছে বীরের ছাঁদে
বিয়ের লগ্ন আটটা,
পিতল বাঁধা লাঠি হাতে
গালেতে গাল-পাট্টা।
শালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে,
আলাপ যখন উঠলো জমে,
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মারলে মাথায় গাঁট্টা,
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয় ঠাট্টা।

বাংলার প্রত্যেক ছেলে-মেয়েরই চিত্ত হরণ করেছে। আর একটি মাত্র নিদর্শন আমরা দেব, সে হল তাঁর যৌবনের লেখা—

দিনের আলো নিভে এলো, সূর্য্যি ডোবে-ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।

মেঘের উপর মেঘ করেছে রঙের ওপর রঙ,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজলো ঠং ঠং।
ওপারেতে বৃষ্টি এলো ঝাপ্সা গাছপালা,
এপারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর ন'দেয় এলো বান।

কবির গীত-সাহিত্য সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা করাই হয়ত সমাচীন হতো, কিন্তু যেহেতু তাঁর গীত-সাহিত্যকে সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সম্পূর্ণ জাতের কবিতা রূপেই পড়া যায়, সেই জন্যে আমরা তাকে কাব্য-শাখার অন্তর্ভুক্ত করেই নিলাম। সুরে গেয় গান রবীন্দ্রনাথ জীবনে তিন হাজারের ওপর লিখেছেন—তাতে স্বদেশী গান আছে, ভগবৎ বিষয়ক গান আছে, প্রকৃতি-সঙ্গীত আছে, প্রেম-সঙ্গীতের ত সীমা-সংখ্যাই নেই। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রূপান্তর, বিভিন্ন অবস্থায় মনের ভাবান্তর এবং তারি অনুপূরক রূপে নব নব সুর, নব নব রসের অজস্র গান তিনি বিতরণ করে গেছেন দেশের হাতে সমস্ত জীবন ধরে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুরকারদের মধ্যেও বৈচিত্র্যে, পরিমাণে এবং উৎকর্ষে সঙ্গীত-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের আসন নিঃসংশয়িত রূপে সর্ব্বোচ্চে। তাঁর কবিতায় সময় সময় অতি বিস্তৃতি দেখা যায়, সময় সময় দেখা যায় অনান্তরিক উক্তিকে অলঙ্কারের জড়োয়া গহনা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার বাহুল্য, সময় সময় আবার তত্ত্বের ভারে বিপর্য্যস্ত করে ফেলতেও দেখা যায়। কিন্তু তাঁর গান

প্রায় সর্ব্বত্রই আন্তরিক, সর্ব্বত্রই মর্ম্মাভিমুখী, আর রূপে-রসে সর্ব্বত্রই অনবদ্য। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম লিরিকই হল তাঁর গান।

দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, পাইনা তোমারে॥

—৬—

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা বলতে বহুদিন পর্য্যন্ত 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ভানু সিংহের পদাবলী' প্রভৃতি কবিতা পুস্তক, 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস, 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রবন্ধ, 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতি নাট্য প্রভৃতি বইকে বোঝাতো—কারণ রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত রচনাবলীর মধ্যে একেবারে গোড়ার পর্ব্বের লেখা হিসাবে এই গুলিকেই পাওয়া যেতো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই গুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম রচনা নয়। আমরা আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-রচনা সুরু করেন মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে—আর তখন থেকেই তাঁর রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে থাকে। সেইখান থেকে সুরু করে উল্লিখিত পর্ব্ব পর্য্যন্ত আসবার আগে রবীন্দ্রনাথ আরো অনেক কিছু লিখেছিলেন, একত্র করলে যার পরিমাণ প্রায় পাঁচশো পাতা অতিক্রম করে যায়। সেই রচনাগুলি হল যথাক্রমে 'বন ফুল' 'ভগ্নহৃদয়' 'কবি কাহিনী' 'রুদ্র চণ্ড', 'করুণা', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'নলিনী', 'কাল মৃগয়া' 'শৈশব সঙ্গীত' ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম তিন খানি কাব্য-কাহিনী, চতুর্থ খানি নাট্য-কাব্য,

তৎপরবর্ত্তী বইটি উপন্যাস, বিবিধ প্রসঙ্গ প্রবন্ধ-সঙ্কলন এবং অবশিষ্ট দু-খানি যথাক্রমে গদ্য নাটিকা ও গীতি নাট্য, আর সর্ব্বশেষ খানি লিরিক ও গাথা কবিতার সমষ্টি। এই বইগুলি কবি লিখেছিলেন চোদ্দ থেকে আঠারোর মধ্যে এবং এর মধ্যে 'করুণা' ছাড়া আর সবগুলি রচনাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, 'করুণা' শুধু 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় অসমাপ্ত ভাবে কিছুদিন প্রকাশিত হয়। এই খানে বলে রাখা যেতে পারে যে 'বন ফুল' প্রকাশিত হয়েছিল 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক একটি সেকালের মাসিক পত্রে, 'ভগ্নহৃদয়' ও 'কবি কাহিনী' ভারতীতে, অবশিষ্ট গুলির মধ্যে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধসমূহও ভারতীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। আর সবগুলিই একেবারে বই হয়ে বের হয়।

এই পর্য্যায়ের রচনাবলীকে কবি পরে সম্পূর্ণরূপেই বাতিল করে দিয়েছেন। এমন কি 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' দিয়ে যে পর্ব্বের সুরু, তার পুনঃপ্রকাশও তাঁর অনভিপ্রেত ছিল। ১৩৩৮ সালে সম্পাদিত 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—'আমার অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিতপদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয়নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।···যে কবিতা গুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি, তার দ্বারা আমাকে দায়ী করলে আমার কোন নালিশ থাকেনা। বন্ধুরা বলেন ইতি-হাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি লেখা যখন থেকে

কবিতা হয়ে উঠেছে, তখন থেকেই তার ইতিহাস।...'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ছবি ও গান' যে এখনো বই আকারে চলছে একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। ঐ তিনটি কবিতা-গ্রন্থের আর কোন অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ, লেখা গুলি কবিতার রূপ পায়নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখী হয়ে ওঠেনি এটাতে কেউ দোষ দেবেনা, কিন্তু তাকে পাখী বললে দোষ দিতেই হবে।...'ভানুসিংহের পদাবলী' সম্বন্ধেও সেই একই কথা। 'কড়ি ও কোমলে' অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্তু সেই পর্ব্বে আমার কাব্য-ভূ-সংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। তারপর 'মানসী' থেকে আরম্ভ করে বাকী বই গুলির কবিতায় ভালো-মন্দ-মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে।'

বলা বাহুল্য কবির এই সমালোচনা এক হিসাবে সত্য, কিন্তু যে রচনাবলী ভূপ্রোথিত ভিত্তিরূপে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমস্ত ইমারতটিকে ধারণ করে রয়েছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচকের কাছে তার প্রয়োজন কম নয়। যে দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রকাশ-রীতি ও অলঙ্করণ-পদ্ধতি রবীন্দ্র-সাহিত্যে কুললক্ষণ রূপে সর্ব্বজন বিদিত, সূচনায় তাদের কি রূপ ছিল এবং ক্রম-বিকাশের ধারায় পরের পর অগ্রসর হয়ে কি ভাবে তারা পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছুলো, তা অনুসন্ধান করা দরকার এবং সেই জন্যেই 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' পর্ব্ব ত নয়ই, তার আগের পর্ব্বকেও বাতিল করা

যায় না। আনন্দের বিষয় এই রচনাগুলি একত্র হয়ে সম্প্রতি 'রবীন্দ্র রচনাবলী…অচলিত সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে 'ভারতী'তে প্রকাশিত কবির 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ', 'স্যাক্সন ও নর্ম্ম্যান সাহিত্য', অসমাপ্ত 'করুণা' উপন্যাস ইত্যাদি কয়েকটি রচনা ছাড়া, কবির সমস্ত বাল্য রচনাই কালানুক্রমে গ্রথিত হয়েছে। বলা অনাবশ্যক যে নিছক সাহিত্যের দিক থেকে এই সমস্ত বইয়ের আজ আর সমালোচনা করা যেতে পারে না। কাব্য-কাহিনী ও নাটক-নাটিকা গুলির কথাই আগে বলি। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়' তিনই হল হতাশ প্রণয়ের কাহিনী। ভাবপ্রবণ একটি তরুণ ও একটি তরুণীর ভালোবাসা কি ভাবে সমাজ-বাধা অতিক্রম করতে না পেরে ব্যর্থ হল, তারই গল্প এই তিনটি বইয়ে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এদের প্লট, পদ্ধতি ও আঙ্গিক প্রায় এক। ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে এখানে প্রত্যাশা করবার কিছু নেই। বাস্তব জ্ঞান ও গভীর জীবন-নীতিও অপ্রত্যাশিত। কিন্তু এই অপরিণত বয়সের রচনাতেও প্রকৃতির সঙ্গে কবি-হৃদয়ের সুনিবিড় যোগ স্পষ্ট করেই অনুভব করা যায়। কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধৃত করছি—

তুই স্বরগের পাখী পৃথিবীতে কেন ?
সংসার কণ্টক বনে পারিজাত ফুল,
নন্দনের বনে গিয়া, গাইবি খুলিয়া হিয়া,
নন্দন মলয় বায়ু করিবি আকুল !

আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে,
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল,
তটিনী বহিছে যথা কল কল স্বরে,
সুবাস নিশ্বাস ফেলে বন ফুল দল।
বনফুল ফুটেছিলি ছায়াময় বনে,
শুকাইলি মানবের নিশ্বাসের বায়ে,
দয়াময়ী বনদেবী শিশির সেচনে
আবার জীবন তোরে দিবেন ফিরায়ে।

—বনফুল

সঙ্গীত যেমন ধীরে আইসে মিলায়ে,
কবিতা যেমন ধীরে আইসে ফুরায়ে,
প্রভাতের শুকতারা ধীরে ধীরে যথা
ক্রমশঃ মিশায়ে আসে রবির কিরণে,
তেমনি ফুরায়ে এল কবির জীবন।
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস,
হু-হু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস!
সমাধি উপরে তার তরুলতা কুল
প্রতি দিন বরষিত কত শত ফুল!
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান.
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান।

— কবি কাহিনী

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো!
ঘুমঘোর ময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব জোছনা সমান
অতি অতি অতি ধীরে কর সখি গান!
নিশার কুহক বলে নীরবতা সিন্ধু তলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর,
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন,
অধীর উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কি শান্ত আছে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি—
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি।
তাই বলি অতি ধীরে অতি ধীরে গাও গো
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!

—ভগ্নহৃদয়

যে অংশগুলি উদ্ধৃত করা হল, তাতে কাঁচা হাতের ও অপরিণত মনের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলির ভেতর

বেশ একটু কবিত্বের ছোঁয়া নেই কি? মানব সংসারে আছে অবিচার, অত্যাচার, অনৈক্য—জীবনের সহজ গতি, স্বচ্ছ প্রশান্তি যা দিচ্ছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নষ্ট করে। কিন্তু প্রকৃতির বুকে রয়েছে অগাধ শান্তি, অকূল মমতা, তাই সংসার বিরাগী কবির হৃদয় খুঁজছে প্রকৃতির সান্নিধ্য, তার ভেতর ডুব দিয়ে তাই ভুলতে চাইছে বাস্তবের শত শত ব্যথা ও বঞ্চনা। কিন্তু সংসার শুনবে কেন? সে তার অনতিক্রমনীয় জাল বিস্তার করেই টানছে মানুষকে, শেষকালে মৃত্যু এসে দিচ্ছে তাকে পরম শান্তি, চরম সমাধানের নির্দ্দেশ—এই হল মোটামুটি ভাবে তিন খানি কাব্যের এবং এদের পরবর্ত্তী 'রুদ্রচণ্ড' নাট্যকাব্যের মূল প্রতিপাদ্য। ছোট বয়সের অনভিজ্ঞ মনে বস্তু-সংসার ও তার বহুমুখে বিক্ষিপ্ত কর্ম্মক্ষেত্র স্বভাবতঃই আনে একটা আশঙ্কার ভাব—প্রকৃতির মর্ম্ম-লোকে চলছে অবাধ স্বাধীনতা ও অগাধ সৌন্দর্য্যের লীলা—তারি ভেতর নিজেকে নির্ব্বাসিত করে বাস্তবকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছাও তাই ছোট বয়সেরই ধর্ম্ম।

যে সংসারে—

কেহ বা রতনময় কনক ভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে,
অথচ সমুখ দিয়া দীন নিরাশ্রয়
পথে পথে করিতেছে ভিক্ষান্ন সন্ধান।

সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লয়ে
সহস্র রক্তের ধারা ক্ষরিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন···

আর—

সহস্র পীড়ন সহি আনত মাথায়
একেব দাসত্বে রত অযুত মানব···

—কবিকাহিনী

তার চেয়ে প্রকৃতিতে—

বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার।
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।
সৌন্দর্য্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগৎ প্রকাশিল,
প্রভাত সহসা বিভাসিল।
বসন্ত লাবণ্যে সাজি গো,
এ কি হর্ষ—হর্ষ আজিগো।
ঊষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম ভাঙা,
হরষে কপোল তার রাঙা।
কুসুম ভগিনীগণ চারিদিক হতে
আগ্রহে রয়েছে তারা চেয়ে,

কখন ফুটিবে চোখ ছোট বোনটির
জাগিবে সে কাননের মেয়ে।

—রুদ্র চণ্ড

'শৈশব সঙ্গীত' নামক কবিতা-সংগ্রহটির কয়েকটি রচনাতেও এই দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই। যেমন—

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার,
প্রাণের পাখীটি উড়িয়া যাক।
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে বুঝি সে
শুনেছে কাহার ডাক।

যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধ্ করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
মরমে লুকায় আশা।

বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায় ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।

এই কবিতা সঙ্কলনটিতে বা 'ভগ্ন হৃদয়' নাট্য কাব্যে অনেক গুলি ছোট ছোট গান আছে—এরাই হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম

রচিত গানের নিদর্শন। এই গানগুলি রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগীদের অপরিচিত নয়, কারণ কবির পরবর্ত্তী গানের বইগুলিতে এরা গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে এরা কবির কৈশোরের রচনা। কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি—'নলিনী খোল গো আঁখি', 'বলি ও আমার গোলাপ বালা', 'কেন গো সাগর এমন চপল', 'দেখে যা লো তোরা সাধের কানন মোর', ইত্যাদি। এই সমস্ত গান এবং কতকগুলি গাথা-কবিতা, যেমন 'লীলা', 'ভগ্নতরী', 'ফুলবালা' ইত্যাদিতে ভাবী রবীন্দ্রের প্রাথমিক বিকাশ লক্ষ্য করা গেলেও, মোটের ওপর এই সমস্ত রচনা কবির নিজের ভাষাতেই 'অপরিণত'। দুই-এক জায়গায় ওরি মধ্যে অবশ্য ঝলমল করে উঠেছে স্ফুটোন্মুখ প্রতিভার দীপ্তি, যেমন—

নাচিছে ছুটিছে গাহিছে খেলিছে,
শত আঁখি তার পুলকে জ্বলিছে,
দিন রাত নাই কেবলি চলিছে
হাসিতেছে খল খল!

তরুণ মনের উচ্ছাসে অধীর,
ছুটেছে যেমন প্রভাত সমীর,
ছুটেছে কোথায়? কে জানে কোথায়!
তেমনি তোরাও আয় ছুটে আয়,
তেমনি হাসিয়া, তেমনি খেলিয়া,

পুলক-উজল নয়ন মেলিয়া
হাতে হাতে বাঁধি করতালি দিয়া
গান গেয়ে তুই চল!

'প্রভাত সঙ্গীতে'র 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় এই কবিতায়, 'কথা ও কাহিনী'র কোন কোন কবিতারও প্রাথমিক কাকলি শোনা যায় কোন কোন গাথা কবিতায়। কিন্তু আমরা আর বেশী নিদর্শন তুলবো না।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ গদ্য কি রকম লিখতেন, অনেকের জানার কৌতূহল থাকতে পারে। সেই জন্যে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ-সংগ্রহ থেকেও কতকাংশ তুলে দিচ্ছি—পাঠকরা দেখবেন, অত ছেলে বয়সেই গদ্য লেখার বাঁধুনি তার কেমন নিপুণ। যে রচনাটি থেকে উদ্ধৃত করছি, তার নাম 'জগৎ-পীড়া'—'জগৎ একটি প্রকাণ্ড পীড়া। অস্বাস্থ্যকে পরাভূত করিবার জন্য স্বাস্থ্যের প্রাণপণ চেষ্টাকে বলে পীড়া। জগৎও তাহাই। জগৎ ও অস্বাস্থ্যকে অতিক্রম করিয়া উঠিবার জন্য স্বাস্থ্যের উদ্যম। অভাবকে দূর করিবার জন্য পূর্ণতাকাঙ্ক্ষার উদ্যোগ। সুখ পাইবার জন্য অসুখের যোঝাযুঝি। জীবন পাইবার জন্য মৃত্যুর প্রযত্ন। জগতের প্রত্যেক পরমাণু পীড়া, কিন্তু সেই প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে স্বাস্থ্যের নিয়ম সঞ্চারিত হইতেছে। এই নিয়ম বর্ত্তমান না থাকিলে জীবন থাকিতে পারে না। অতএব এই জগতের যে চেতনা, তাহা পীড়ার চেতনা।'

এই সমস্ত নিদর্শন থেকে আমরা মোটের ওপর এইটুকু দেখ্‌তে চেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পরবর্ত্তী কালে সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগেই যে পূর্ণ বেগে প্রবাহিত হয়েছিল, তার পূর্ব্বাভাষ তিনি বাল্যেই দিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশরীতিতে আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে—কিন্তু তাঁর মতবাদ ও জীবন-দর্শনের কোন কোন শাখার বৈজিক চিহ্ন তাঁর এই বাল্য রচনাতেও পাওয়া যায়। আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ঐ সময়ের নিছক বস্তুধর্ম্মী রচনার জনতা ভেদ করে ধীরে ধীরে একটি প্রাণ-ধর্ম্মী সাহিত্য দৃষ্টি আপনার পথ আপনিই তৈরি করে কি করে এগিয়ে আসছে—এই কাঁচা লেখাগুলোর ভিতর দিয়েও তা টের পাওয়া যায়, তাই এগুলোকে নিছক 'বাল্য রচনা' বলে বাতিল করা যায় না। রবীন্দ্র-প্রতিভার সম্যক বিচার যাঁরা করবেন, তাঁদের কাছে এগুলি তাই অপরিহার্য্য এক-একটি land-mark স্বরূপ।

———

তৃতীয় খণ্ড : তত্ত্ব

রবীন্দ্র-তত্ত্ব

নিজের জীবনে রবীন্দ্রনাথ স্কুল-কলেজের বাঁধা পাঠ্য পড়ে বিধিনির্দ্দিষ্ট পন্থায় পরীক্ষা পাশ করতে পারেন নি। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে সমস্ত মানুষকেই একটা বিশেষ ছাঁচে ফেলে মানুষ করবার চেষ্টা করা হয়—ধরে নেওয়া হয় যে মানসিক গঠন অনুসারে সমস্ত মানুষই এক, তাই একই পদ্ধতিতে একই আদর্শে সকলকে লাইন-বন্দী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ছাপ দিয়ে দেওয়াই হল এই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সব মানুষই এক নয়—প্রত্যেকের মনন-ধারা স্বতন্ত্র, তার আহরণের পদ্ধতিও এক নয়, কাজেই প্রচলিত ব্যবস্থায় পরীক্ষা পাশ অনেকে করলেও, শিক্ষালাভ করে খুব কম সংখ্যক লোকই। তাছাড়া যে পাঠ্য-তালিকা আমাদের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার ভেতর মনের ঐশ্বর্য্য ও চিন্তার স্বকীয়তা বৃদ্ধির উপযোগী জিনিসও খুব বেশী নেই। কতকগুলো প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় তথ্য একত্র করে শিক্ষার্থীর মাথাব ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া এবং কোন এক সময়ে পরখ করে দেখা যে সে ঠিক ঠিক আহৃত বিষয়গুলি আবৃত্তি করে যেতে পারে কিনা —এতেই এই শিক্ষা সমাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ছক-বাঁধা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নি এবং দেশের ভাবী নর-নারীর পক্ষেও একে অসার্থক বলে

মনে করেছেন। তাঁর নিজের শিক্ষালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যই হল এর প্রতীকারে অগ্রসর হওয়া এবং নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী আদর্শে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। সেই জন্যে তিনি সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা থেকে ডিগ্রির লোভকে বিতাড়িত করলেন এবং তার স্থানে নিয়ে এলেন চিন্তার আনন্দ ও প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য। নীরস নিরুজ্জ্বল পাঠ্য বিষয় গুলির সঙ্গেই তিনি সংযুক্ত করলেন নৃত্য, গীত ও চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি কলা বিদ্যার এবং পাঠ্য বিষয়ের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী যা আহরণ করবেন, সৃষ্টির ভেতর দিয়ে তাকে প্রকাশ করাকেই তিনি সবচেয়ে বড় শিক্ষা বলে ধরে নিলেন। এই জন্যে তিনি সব চেয়ে বড় করে ধরলেন প্রকৃতির মধ্যে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পন করার আদর্শ—খোলা মাঠে, উন্মুক্ত আকাশের তলায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে নিত্য-নিয়মিত প্রকৃতির রাজ্যে চলছে যে সমস্ত ভাঙাগড়া, তার ফুল-ফল কীট পতঙ্গ জীব-জন্তু প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে যে বৈচিত্র্য ও অভিনবতা, তা থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে, একান্ত ভাবে বিষয়াত্মক শিক্ষা লাভ মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবণতার বিরোধী বলেই তাঁর ধারণা—এবং ভাবী পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একান্ত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়া অতিক্রম করার জন্যে পড়ে যাওয়ারও তিনি কোন সার্থকতা দেখতে পাননি। তিনি মনে করেছিলেন, বাইরের জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে একটি যোগ-সূত্র স্থাপন করে, নিত্য নূতন প্রসঙ্গের অবতারণার দ্বারা মানুষের মনে চিন্তা, কল্পনা, অনুভূতি ও বিচার-বিশ্লেষণের

প্রবৃত্তিকে উদ্রিক্ত করাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষাই হল সমস্ত মননশীলতার চালক-শক্তি স্বরূপ। যার মনে দেখবার ও দর্শনীয় বিষয়কে উপভোগ করবার, বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করে বোঝবার বা বোঝাবার শক্তি এসেছে, তথ্যের অভাব তার মনকে বাধা দিতে পারে না—তথ্য সে আপনি আহরণ করে নিতে পারে, এমন কি স্বল্প তথ্যের পুঁজি নিয়েও সংস্কৃতির মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে।

আসলে শিক্ষা-প্রসঙ্গে পাঠ্য বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা কি? ধরা যাক ব্যাকরণ—ভাষার ব্যবহার ও বিন্যাসের কতক-গুলি নিয়ম-কানুন বেঁধে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য, কিন্তু যে ভাষার সাহায্যে ভাব প্রকাশ করবার জন্যে লেখনী ধারণ করবে, এই নিয়ম-কানুনে প্রয়োজন তারই। প্রাত্যহিক সংসারে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের জন্যে যখন আমরা কথা বলি, তখন ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগ সহজও নয়, সম্ভবও নয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয়ই হল এক-একটি উদ্দেশ্যের পরিপূরক, কিন্তু আমাদের শিক্ষায়তনে আদি উদ্দেশ্যটিই গেছে চাপা পড়ে—তার স্থানে এসেছে শুধু আনুষঙ্গিক কড়াকড়ি গুলো। তাই আজ নাবালক শিক্ষার্থীকে সমাস, সন্ধি ও তদ্ধিত-কৃতের জাঁতা-কলে ফেলে নাকাল করা হয়, কিন্তু যে জন্যে এদের প্রয়োজন, সে দিকটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় না মোটেই। যদি নবীন শিক্ষার্থীকে তার স্বাধীন ইচ্ছানুসারে মনোভাব প্রকাশের জন্যে ভাষা ব্যবহার করতে শেখানো হতো, এবং তারই পথে প্রয়োগ

ও বিন্যাসগত ভুল-ত্রুটি গুলি উদ্‌ঘাটিত করে দেখানো হতো, তাহলে ব্যাকরণ তার কাছে এমন ভয়াবহ পদার্থ হয়ে উঠতো না।

সমস্ত বিষয় সম্বন্ধেই মোটের ওপর এই কথা। গণিত ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান আমরা পড়ি কেন? জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোথায় এদের প্রয়োগ না জানা থাকায়, স্কুল-কলেজে প্রত্যক্ষ সংস্রব থেকে বিচ্যুত করে শিক্ষণীয় বিষয় গুলিকে আমরা করে তুলি এক-একটি নীরস তত্ত্বের সমষ্টি এবং এখানেই আমাদের শিক্ষাদান প্রণালীর সত্যকার ত্রুটি। জীবন সম্পর্কে শিক্ষণীয় প্রসঙ্গের যোগ লক্ষ্য করলে, স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি দিয়েই শিক্ষার্থী তার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখনই তা তার চিন্তা ও মননশীলতার রাজ্যে স্থায়ী আসন লাভ করে। তার সুযোগ না থাকলে, হৃদয়ঙ্গম করার আশা ছেড়ে দিয়ে তাকে শুধু মুখস্থ করার ওপর জোর দিতে হয়। এই ভাবেই এসেছে আমাদের দেশে অর্থ পুস্তক Short-cut ইত্যাদি এবং প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার এই তিন পর্ব্বকেই পরিণত করেছে নির্ব্বিচারে পরীক্ষা পাশ করায়।

রবীন্দ্রনাথ এই কৃত্রিম শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যতিক্রম ঘটালেন তাঁর প্রতিষ্ঠানে। আগেই বলেছি, তিনি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে যে অধ্যয়ন তার সমর্থক নন—সেই সঙ্গেই দেখিয়েছি মনের সহজ আনন্দ ও স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে প্রাত্যহিক অনুভূতি গুলির ভেতর দিয়ে কল্পনা ও মননশীলতার

প্রসার ঘটানোকেই তিনি নিয়েছেন সত্যকার শিক্ষা বলে। সেই জন্যে তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় কলাবিদ্যা নিয়েছে মূল স্থান, আর তত্ত্ববিদ্যা হয়েছে তার সহকারী। কলা বিদ্যার সঙ্গে মানুষের যে যোগ, তা হল আনন্দের যোগ—এই আনন্দই হচ্ছে সমস্ত আহরণের আদি উপকরণ, যাকে আমাদের কেতাবী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ছেঁটে বাদ দিয়েছে। সেই জন্যেই আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের মনের সঙ্গে সহজ আনন্দে একাকার হয়ে যেতে পারে না। পরীক্ষা পাশের পরই সুরু হয় আমাদের জীবিকা সংগ্রহের পালা এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে আমাদের অবলম্বিত বৃত্তির সঙ্গে আমাদের আহৃত বিদ্যার কোন সংস্রব নেই। সে বিদ্যা অনুশীলন ও উপলব্ধির অভাবে কখন মন থেকে স্খলিত হয়ে গেছে। কিন্তু যদি আমাদের শিক্ষাকে আমাদের অন্তরের রসে রসিয়ে নিতে পারতাম, তাহলে আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে অন্তঃপ্রবাহী ধারার মতো তা বয়ে চলতো। এই অন্তর গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ প্রণয়ন করলেন তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থা—সেই জন্যে তা থেকে তিনি সমুদয় কৃত্রিমতা ও সাম্প্রতিক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্য বিতাড়িত করলেন এবং খোলা মাঠে ছেলে ও মেয়ে একত্রে খেলা-ধূলো গান-গল্প আমোদ-প্রমোদের ভেতর দিয়ে যাতে অনায়াসে সংস্কৃতি ও সভ্যতার, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রাণ-সম্পদে ঋদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, তার অনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করলেন। এই সঙ্গেই তিনি লক্ষ্য রাখলেন, যাতে ভাব

ও অনুভূতির রাজ্যে একান্ত ভাবে নির্ব্বাসিত হয়ে তারা বাস্তবতা-বিমুখ না হয়ে ওঠে—সেজন্যে শান্তিনিকেতনের ভাব-বিদ্যালয়ের সঙ্গেই তিনি স্থাপন করলেন শ্রীনিকেতনের শিল্প-বিদ্যালয়।

বিভিন্ন শ্রম-শিল্পের সাহায্যে হাতে-কলমে জীবিকার্জ্জন শিক্ষা দেওয়া ভিন্ন ভাবতান্ত্রিক শিক্ষায় সুফলের চেয়ে কুফল হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই বিচক্ষণ কবি বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ভাবমূলক শিক্ষার বাহন রূপে স্থাপন করে, জাতির সামনে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষাদর্শ স্থাপন করলেন। দেশে-বিদেশে আজ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে চলেছে বকমারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা —রবীন্দ্রনাথের দানও সে দিক থেকে সমস্ত জগতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু যুগ-ধর্ম্মে এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে প্রধানতঃ অর্থকরী এবং অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে ডিগ্রীই হল একমাত্র যোগ্যতা নিরূপণের মাপকাঠি। কাজেই এদেশের বেশীর ভাগ গৃহস্থই তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ডিগ্রীহীন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ইচ্ছুক বা সাহসী হলেন না। সেই জন্যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস-বাঁধা পাঠ্য পড়ানো এবং তার পরিচায়ক ডিগ্রী অর্জ্জন করানোকেই সানুরাগে আঁকড়ে রইলেন। আর রবীন্দ্রনাথকে চালাতে হল তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে, যাদের অনেককেই চাকুরির দ্বারা অন্ন আহরণ করতে হবে না। সেই জন্যেই প্রথম শ্রেণীর মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র তিনি বেশী পেলেন না, যাদের উপর তাঁর

আদর্শ প্রয়োগ করে তিনি সত্যকার সাফল্য পেতে পারেন। তাই জনগণের রুচি ও অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শেষকালে তাঁকে বিভিন্ন কলাবিদ্যা অনুশীলনের সঙ্গেই স্বীকার করতে হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থিত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্য পড়ানো এবং পরীক্ষা দেওয়ানো—কিন্তু অন্তরের সঙ্গে তিনি শেষদিন পর্য্যন্ত এর অনুমোদন করেননি। তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তির পর এখনকার কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর কোন পন্থা অবলম্বন করবেন তা আমাদের জানা নেই। তবে যত দূর মনে হয়, কবির পরিকল্পনাকেই তাঁরা বাঁচিয়ে রাখতে যথাশক্তি চেষ্টা করবেন।

—২—

দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মতো সমাজ-ব্যবস্থারও কবি আমূল সংস্কার চেয়েছিলেন—ধর্ম্মের ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ অনুসারে ভাগ করা সামাজিক কাঠামোকে তিনি স্বীকার করেন নি। প্রাচীন কালের অবস্থা ও প্রয়োজনের অনুকূলে গঠিত বিধি-বিধানের দাসত্ব করা এবং যুগোচিত পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে সংশোধন করে না নেওয়ার মনোভাবকে তিনি প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করেছেন বার বার। যে সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের জন্যেই মূল্য দেয়নি, দিয়েছে জন্মের জন্যে, এবং শিক্ষা-দীক্ষায় স্বভাবে-সংস্কৃতিতে সর্ব্বসাধারণের বড় হয়ে ওঠার পথ যা অবারিত করে দেয়নি—বরং জাতিভেদের, কৌলীন্যের, বর্ণাশ্রমিক

অভিজাত্যের বেড়াজাল পেতে সে পথ দুরতিক্রম্যই করে রেখেছে, কবি মনে করেছিলেন, আমাদের পরাধীনতার চেয়ে তা ঢের বেশী ক্ষতিকর।৮

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ থেকেই তিনি এই সংস্কারের প্রেরণা পেয়েছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং মনন-শীলতারও প্রবর্ত্তনা ছিল। জাতিভেদকে তিনি আমাদের সামাজিক সংহতি লাভের পথে সব চেয়ে বড় শত্রু বলে বুঝে-ছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে শুধু লেখনী ধারণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, প্রত্যক্ষ ভাবেই এর সংস্কারে অগ্রণী হয়েছিলেন। তথা-কথিত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পান-ভোজন ও বিবাহের প্রবর্ত্তন হলে, একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই পারস্পরিক ভেদ অপসারিত হতে পারে—একে অন্যের স্বার্থ ও সম্ভ্রম রক্ষা করা বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠতে পারে,এই ছিল তাঁর ধারণা। তাই বিশ্বভারতী আশ্রমে তিনি বিভিন্ন দেশ ও জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একত্র পান-ভোজনের প্রথা প্রবর্ত্তন করেছিলেন—পারি-বারিক জীবনেও তিনি একাধিক অন্তর্ব্বিবাহ স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি এমনি একটি উদার ও প্রগতিশীল আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, যা সকলকেই উৎসাহিত করেছে।

বলা বাহুল্য মত পোষণ বা প্রচার করা এক জিনিষ, তাকে কার্য্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা আর এক জিনিষ। আমাদের দেশে সংস্কারের প্রয়াস যা হয়েছে, সবই প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ কাগজে-কলমে, তাই বিধবা বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ

যুক্তি-তর্ক বা আইনের দিক থেকে স্বীকৃত হয়েও, আজো সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতে পারেনি—মত হিসাবে আমরা এদের উপযোগিতা স্বীকার করি, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এদের অনুষ্ঠান যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গেই বর্জ্জন করে চলি। রবীন্দ্র-নাথের মতো সত্যদ্রষ্টা পুরুষ এ ধরণের প্রতারণা করতে পারেন না। তাই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন, নিজে তিনি রন্ধন ও খাদ্য পরিবেষণের জন্য অন্ত্যজ এমন কি অহিন্দুকে পর্যান্ত ভৃত্য রেখেছিলেন। ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, যুগের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে, কোন্ সুদূর অতীতে যে সমস্ত আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, অন্ধভাবে তার আনুগত্য করা যে দেশের সাধারণ রীতি, সে দেশে এই দুঃসাহস বড় কম জিনিষ নয়। কিন্তু এই টুকুই রবীন্দ্রনাথের সমাজ-দৃষ্টির সমগ্র পরিচয় নয়।

আমাদের পুরাণো সমাজ-ব্যবস্থায় নারীকে নানা দিক থেকেই রাখা হয়েছিল বিড়ম্বিত করে। তার শিক্ষাকে যথোচিত ভাবে স্বীকার করা হয়নি, তার স্বাধীনতা, সামাজিক মর্য্যাদা, সর্ব্বোপরি তার মানবিক অধিকার ছিল অন্তঃপুরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ। অভিভাবক কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত স্বামীকে অপ্রতিবাদে গ্রহণ, তাঁর সাংসারিক দায়িত্ব প্রতিপালন ও সন্তানধারণই ছিল নারীর একমাত্র কর্ত্তব্য। এর বাইরে তাকে দেওয়া হয়েছিল একমাত্র অধিকার, বৃদ্ধ হলে তীর্থ ভ্রমণে বের হবার—নয়ত গুরু গোঁসাইয়ের কাছে ধর্ম্মব্যাখ্যান শুনবার। এ জীবন যে মানুষের

পক্ষে অনভিপ্রেত, তা পর্য্যন্ত কারুর মনে হয়নি। বরং অনেকে এর ভেতর প্রাচ্যসুলভ সমাজ-কৌলীন্যেরই পরিচয় পেয়েছেন। নারীর এই শোচনীয় দুর্দ্দশার প্রতীকারে প্রথম অবহিত হয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজ—তাঁরাই নারীর শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নাবালক বয়সে বিবাহ দেওয়া, যথাসময়ের বহু আগেই সংসারের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে, তাকে চিরকালের মতো পঙ্গু করে ফেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তা গ্রহণ করেন নি—এমন কি এই প্রচেষ্টাকে তাঁরা ব্যভিচার বলেই মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বোঝালেন যে নারী পুরুষের যোগ্য সহচরী হবার অধিকারিণী—তাকে সেই রকম শিক্ষা দিলে, সম্মান দিলে, সে যে সমাজ-জীবনের উন্নয়নে কত বড় অংশ নিতে পারে, তা তাঁর রচনার ভেতর দিয়েই দেশ প্রথম শিখলো।

তিনি বোঝালেন যে মাতা রূপে, পত্নী রূপে, সখী রূপে তার যেমন পুরুষের প্রতি কর্ত্তব্য আছে—পুত্র রূপে, স্বামী রূপে, সুহৃদ রূপে পুরুষেরও তার প্রতি আছে তেমনি কর্ত্তব্য। আমাদের পুরুষ সমাজ নির্লজ্জ স্বার্থপরতার সঙ্গেই নিজেদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেয়, কিন্তু অন্যেয় প্রাপ্য সম্বন্ধে সুবিবেচনা করে না—এর ফলও ফলে মারত্মক রূপে। নারী শিক্ষায়-দীক্ষায় আচারে-সংস্কারে পরিপূর্ণতা লাভ করে না—তথাকথিত আন্তঃপুরিক কর্ত্তব্যও তাই তার দ্বারা সুচারু রূপে সম্পন্ন হতে পারে না।

সমাজ-জীবনের অর্দ্ধাঙ্গ হল নারী—সেই অঙ্গ জড়তা ও কুসংস্কারের ভারে হয়ে রয়েছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তাই এ সমাজ মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়াতে পারে না কোন দিন, নারীর অনগ্রসর অবস্থা তাকে টেনে নীচেয় নামায়।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন-নীতিতে পুরুষ নারীর চেয়ে স্বভাবতঃই শ্রেষ্ঠ নয়, নারীকে এসবের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলেই এ রাজ্যে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার কায়েম রয়েছে—নারীকে পথ ছেড়ে দিয়ে দেখা দরকার, সে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে কিনা। এই মতবাদকে রূপ দেবার জন্যে তিনি নারী ও পুরুষের সহ-শিক্ষা সমর্থন কয়েছিলেন এবং পতি-নির্ব্বাচনে যেমন, অবাঞ্ছিত বিবাহ বন্ধন ছেদনে তেমনি পুরুষের মতোই নারীর স্বাধীনতা পূর্ণ ভাবে অনুমোদন করেছিলেন।

অনগ্রসর সমাজে যাদের জন্ম হয়েছে এবং সেই কারণেই যারা লেখাপড়া শিখতে বা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে আগাতে পারে নি, তাদের সুযোগ-সুবিধা দিলে, তারা যে তথাকথিত উচ্চ-শ্রেণীর চেয়ে কম যায় না এবং নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দিলে, তারাও যে কোন ক্ষেত্রেই পিছনে পড়ে থাকে না—এ আজ পরীক্ষিত হয়েছে, ধীরে হলেও সমাজে এই আদর্শ আজ প্রতিষ্ঠিত হতেও চলেছে। বলা অনাবশ্যক, এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর পেছনে রবীন্দ্রনাথের দানই হল সবচেয়ে বেশী।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বা সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রগতিশীল এবং সংস্কারপন্থী ছিলেন বলেই তিনি যা-কিছু প্রাচীন তার ধ্বংস কামনা করতেন না। শিক্ষার ব্যাপারে তিনি অগ্রগামী জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে সমস্ত গ্রহণীয় বস্তু আহরণের পক্ষপাতী হয়েও, এদেশের যা মহৎ, যা সত্য, যা কল্যাণ-প্রদ, তাকে সমর্থন করেছিলেন। তাই তিনি প্রাচীন আদর্শে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন এবং উপকরণহীন আত্মজ্ঞান-ঋদ্ধ জীবনাদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কার্য্যতঃ সফল হননি হয়ত, কিন্তু তাঁর লক্ষ্যটা আমাদের ভুল করলে চলবে না। সমাজ ব্যাপারেও তিনি অনুন্নতের উন্নয়ন এবং নারীর অগ্রগতি সম্পূর্ণ রূপ স্বীকার করেও একথা স্বীকার করতেন যে অবস্থানির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষই নাগরিক হবে না—তার মধ্যে অনেককেই হতে হবে কৃষক, শ্রমিক ও বৃত্তিজীবী এবং সেই ভাবেই করতে হবে সমাজ-সৌধের ভারসাম্য রক্ষা—সমস্ত নারীই রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মানুশীলন করবেন না, তাঁদের অনককেই হতে হবে সংসারী এবং সন্তান ধারণ ও পালনের দায়িত্বও নিতে হবে। তা সত্ত্বেও তাঁদের মানুষ হিসাবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে হবে, এই হল তাঁর মত। অর্থাৎ তাঁর সংস্কার-নীতির পেছনে ছিল সত্যকার একটি গঠন মূলক পরিকল্পনা—নিছক মত প্রকাশের নূতনত্বকে তিনি শ্রদ্ধার্হ মনে করেন নি।

—৩—

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিও এক হিসাবে তাঁর সমাজ নীতির অন্তর্ভুক্ত। কারণ প্রত্যক্ষ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্বিশেষ পলিটিক্সের চর্চ্চা তিনি করেন নি—সমাজ-জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণের উপায় হিসাবেই তিনি স্বীকার করেছিলেন রাজনীতিকে। তাই তাঁর রাজনীতিতে আক্রমণাত্মক জাতীয়তা-বাদ নেই—বরং সেই ধরণের জাতীয়তা-বাদের বিরোধী রূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি। তিনি চেয়েছিলেন, এদেশের লোক জাতিধর্ম্ম নির্বিবশেষে সুশিক্ষা লাভ করবে, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঞ্চয় আহরণ করবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃষি-শিল্পে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমমর্য্যাদায় অভিষিক্ত হবে।

এই পরিকল্পনার সাফল্যের পথে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন দুটো প্রকাণ্ড বাধা—এক পরকীয় শাসন-ব্যবস্থা ও তার অনুগামী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভুত্ব, আর অপ্রগতিশীল প্রাচীন পন্থীতা ও তার আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠান, তাই তিনি এ দুইয়েরই বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, তাদের সাহস, সত্যনিষ্ঠা, উদ্যম ও উদ্ভাবনী-শক্তিকে তিনি অনুকরণীয় বলে স্বীকার করতেন—তাই তিনি বৈদেশিক সংস্রবকে কোন দিনই অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন না। বরং এ-দেশের অনড় একগুঁয়ে

রক্ষণশীলতাকে ও-দেশের প্রাণবন্ত সংস্কৃতির সংস্পর্শে জাগিয়ে তোলারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। বলা অনাবশ্যক, দেশের পক্ষে বৈদেশিক শাসনের তিনি বিরোধী ছিলেন এবং সে বিরোধিতার কারণ, এই শাসনের সঙ্গে কল্যাণের যোগ নেই—এ-দেশের শক্তি, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির তা পরিপোষক নয়। কিন্তু তাই বলে তিনি জাতি-দ্বেষ সম্পন্ন ছিলেন না বা অন্য দেশ ও জাতির ক্ষয়কে স্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষে কল্যাণাবহ ভাবতেন না। সর্ব্বমানবের মধ্যে ভাবিক ও নৈতিক আদান-প্রদানের দ্বারা একটি অখণ্ড মানবগোষ্ঠী গঠনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের লক্ষ্য। যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাসন ও নিপীড়নের দ্বারা সমস্ত জাতিকে পরাভূত ও সমস্ত দেশকে কবলিত করে, সেই ধ্বংস-স্তূপের ওপর আপন জাতির গৌরব-সৌধ গড়ে তোলার ভয়াবহ আদর্শকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন।

তাঁর এই ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্য-লিপ্সা থেকে উৎসারিত যুদ্ধ দেখে। ভারত সম্পর্কেও তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র মতমত প্রকাশ করেছেন। শুধু এই দিক থেকেই তাঁর এই বিরোধিতাকে বৈরিতা বলে মনে করলে ভুল করা হবে। মানুষের মানবিক অধিকারের প্রতিকূল বলেই তিনি বৈদেশিক শাসনকে ঠিক ততটাই আঘাত করেছেন, যতটা আঘাত করেছেন তাঁর স্বাদেশিক সমাজ-ব্যবস্থাকে। এ-দেশের স্বাস্থ্য,

শিল্প, কৃষি প্রভৃতির ধ্বংস হয়েছে যে কারণে, আর যে কারণে লুপ্ত হয়েছে মানুষের চরিত্র, মর্য্যদা, মনুষ্যত্ব, তিনি তার কোনটাকেই ক্ষমার্হ মনে করেন নি।

যে সমাজ ধর্ম্মগত জাতি-বিভাগের প্রবর্ত্তন করে, জাতির অখণ্ডতা নষ্ট করেছে—এবং একই সম্প্রদায়ের ভেতর রকমারি শ্রেণী নির্দ্দেশ করে, কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিতও অবশিষ্টদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ করেছে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে ব্যবস্থার সংস্কার না করে, অভ্যাসের দাসত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং তারি সুযোগে ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের খাতিরে বহু অনাচার, অত্যাচার, কদাচার ও অসত্যকে মাথা পেতে নিয়েছে, তিনি সমান নির্ম্মম হস্তে তাকেও শাসন করেছেন। শুধু শাসনই নয়, তাকে সত্য পথেরও সন্ধান দিয়েছেন। তাই তাঁর রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে, সমাজ-নীতির কথাও প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে।

এইখানে তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনার মোটা কথা আরো দু-একটি বলে রাখা দরকার। এ-দেশের প্রাণ-কেন্দ্র প্রধানতঃ পল্লীতেই নিবদ্ধ—তার চাষ-বাস, গৃহ-শিল্প, বৃত্তি-ব্যবসা ইত্যাদির ওপর ভর দিয়ে সমস্ত দেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে—কিন্তু নাগরিক জীবনের ক্রমস্ফীতি এবং বুদ্ধিমান ও সমৃদ্ধ জনগণের দলে দলে গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে আসার ফলে পল্লীর সামাজিক শৃঙ্খলা ক্রমেই বিপর্য্যস্ত হচ্ছে, তার শক্তি এবং সম্পদও হচ্ছে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত। এর ওপর আছে মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ

আরো রকমারি উৎপাত—ইদানীং তারি সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক কলহ। সুতরাং পল্লীর প্রাণ-শক্তি যে আজ কণ্ঠাগত হয়ে উঠেছে তা বলাই বাহুল্য। এদিকে সহরেও জনতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত শ্রম-শিল্পের বিস্তার হয়নি, ফলে সেখানেও দেখা দিয়েছে বেকার সমস্যা, অবিবাহ এবং আরো নানা সঙ্কট। কাজেই গ্রামে ও নগরে সর্ব্বত্রই আজ দেশবাসীর দুর্দ্দশা চরমে উঠেছে।

এই অবস্থার প্রতীকারে রবীন্দ্রনাথ নির্দ্দেশ দিয়েছেন পল্লীকে পুনর্গঠিত করে তুলবার। নদী নিয়ন্ত্রণ করে, বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিধানের যুগোপযোগী ব্যবস্থা করে, সর্ব্বোপরি ব্যবসা-বাণিজ্যের নব নব পন্থা উদ্ভাবন করে পল্লী-জীবনকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে—তাতে সহরের প্রয়োজনাতীত জনতা হ্রাস পাবে, গ্রামেরও জীবনী-শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লী-গঠনকে তাঁর রাজনীতির প্রধান অংশরূপে স্বীকার করেছিলেন—এবং শিক্ষিত-সাধারণের সঙ্গে গণ-সাধারণের সংযোগ সাধনের দ্বারা এই পরিকল্পনাকে কাজে খাটাবারও নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কৃষি ও শিল্প বিদ্যা শেখানো, পল্লীসংগঠন, লোকশিক্ষা বিতরণ ইত্যাদির যে সমস্ত আয়োজন হয়েছে, তাতে এই পরিকল্পনাকে যথাসম্ভব রূপ দেবারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

সাম্প্রদায়িক কলহ আমাদের এ-কালীন রাজনীতির একটি

বৃহৎ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সমাধানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মননশীলতাকে নিয়োগ করেছিলেন। উভয় পক্ষের সহনশীলতা এবং উদার বুদ্ধিই যে এই সমাধানের একমাত্র উপায়, তা সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু কি করলে সেই সহনশীলতা জন-মনে সঞ্চারিত করা যেতে পারে? রবীন্দ্রনাথ বললেন যে পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ই হল এর একমাত্র উপায়। হিন্দুর সংস্কৃতি যখন মুসলমান সম্যক রূপে উপলব্ধি করবেন, আর মুসলমানের সংস্কৃতি হিন্দু হৃদয়ঙ্গম করবেন, তখন দেখবেন যে ব্যবহারিক আচার-অনুষ্ঠানে পার্থক্য যাই থাকুক, সব ধর্ম্মেরই প্রতিপাদ্য এক, লক্ষ্য এক। পরস্পরের মধ্যে অপরিচয়ের দরুণ এই ঐক্য-সূত্রটি আমরা ধরতে পারি না, তাই বহিরঙ্গিক পার্থক্য গুলোকে বড় করে তুলে বিবাদে প্রবৃত্ত হই। এজন্যে দরকার অনুদার এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার করে, নিজের নিজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম-নীতির মূলতত্ত্বগুলি ভিন্ন সম্প্রদায় গুলির সামনে মেলে ধরা। দেশের শিক্ষায়তনে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, জাতীয় আন্দোলনে সর্ব্বত্রই রয়েছে এই অনুদারতা—তার ওপর পরকীয় রাষ্ট্র-শক্তির উদ্দীপনা রয়েছে এর পেছনে, তাই প্রতি পদে-পদেই দেশে অশান্তি ধূমায়িত হচ্ছে। দেশবাসীর ধর্ম্মগত পরিচয়কে পারিবারিক জীবনে এবং ভৌগলিক পরিচয়কে জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, এ উপদ্রব আপনিই তিরোহিত হবে। কিন্তু সেজন্যে অগ্রণী হতে হবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনীতিক রচনাবলীর বহু স্থানেই

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এইভাবে এর সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

—৪—

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত এবং পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাবে বাল্য থেকেই তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদের প্রবর্ত্তনা। তাঁর সমস্ত জীবনের সাহিত্যেই উপনিষদের প্রভাব সুস্পষ্ট রূপে লক্ষ্য করা যায়—তাঁর বৈশ্বমৈত্রী, তাঁর সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি, তাঁর আনন্দবাদ, সবই এসেছিল উপনিষদ থেকে। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদেই তাঁর মনন-ধারাকে আবদ্ধ রাখেননি—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম্মের এবং বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাবও তাঁর ওপর পূর্ণ ভাবেই পড়েছিল। উত্তর-ভারতীয় সন্তদের এবং বঙ্গীয় বাউলদের প্রভাবও কম পড়েনি।

তাঁর কান্তাভাবের গান ও কবিতা গুলির মধ্যে পাওয়া যায় বৈষ্ণব গীতিকবিতার ছায়া। সেই পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, ভাব-সম্মেলন, বাসক সজ্জা, মিলন, বিরহ—আর যা-কিছু আদর্শ বৈষ্ণব কবিদের অবলম্বন, তাঁর রচনাতেও তারা নব রূপে প্রতিভাত হয়েছে। ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে রুদ্রকে, সৃজনের মধ্যে দিয়ে শক্তিকে তিনি বার বার উপলব্ধি করেছেন—বাণী রূপে, সারদারূপে, লক্ষ্মীরূপে মাতৃত্বের বিভিন্ন পর্য্যায়কেও তিনি স্বীকার

বৌদ্ধ ধর্ম্মের নীতি-বিশুদ্ধি, খৃষ্ট ধর্ম্মের আত্মসমর্পণও

বার্দ্ধক্যে রবীন্দ্রনাথ

তাঁতে পূর্ণ মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু ইসলামের কোন ছায়া তাঁতে পাওয়া যায় না, যদিও প্রেমকাব্যে সুফীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর ভাবসাদৃশ্য পাওয়া যায়।

এ থেকে এই কথাই দাঁড়ায় যে ব্রাহ্ম রূপে কবির যে পরিচয়, তা হল তাঁর সামাজিক পরিচয়—তাঁর ভাবিক জীবন ও চিন্তা-ধারায় সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয়ের একটি অপূর্ব্ব পরিণতিই লক্ষ্য করা যায়। শান্তিনিকেতন পর্য্যায়ের ধর্ম্মাব্যাখানে বা নৈবেদ্যের কবিতায় বা কতকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতে অবশ্য তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মকেই সজাগ ভাবে প্রচার করেছেন—বাক্য-মনের-অগোচর যে পরমার্থ জগৎ ও জীবের ভেতর অদৃশ্য চেতনা রূপে বিদ্যমান থেকে, নব নব রূপে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছেন—তিনি কখনো রুদ্র, কখনো কান্ত, কখনো আনন্দময় পরম পূর্ণতা, কখনো প্রাণময় পরম সার্থকতা-সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারকে পরিব্যাপ্ত করেই রয়েছেন তিনি, তিনিই স্থূল রূপে এই জগৎ-প্রপঞ্চ, আবার দিব্য রূপে এর আত্মা—এ কথা তিনি বহুবারই বহু প্রকারে বলেছেন।

কিন্তু এই পরম সত্ত্বাকে নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক করে রবীন্দ্র-নাথ কখনো গ্রহণ করেন নি, এঁকে ব্যক্ত করার জন্যে পদে-পদেই নিয়েছেন প্রতীকের আশ্রয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চলে এসেছেন পৌত্তলিকতার এলাকায়। অরণ্যের মধ্যে যে প্রাণ-শক্তি তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন অরণ্য-লক্ষ্মী রূপে—সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয়তা, তাকে তিনি অঙ্কিত করেছেন সুন্দরের দূত রূপে, মিলনোৎসুক প্রেমিক রূপে—মৃত্যুর মধ্যে, ধ্বংসের

মধ্যে যে ভয়ঙ্করতা, তাকে তিনি অনুভব করেছেন নৃত্য-উন্মাদ নটরাজ রূপে। এই যে প্রতীকাশ্রয়ী দৃষ্টি-ভঙ্গী, একে পৌত্তলিকতাই বলা যাবে। এমন কি, বিধিবদ্ধ পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম্মের পরিচিত প্রতীক গুলিকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিই—

অন্নপূর্ণা মা আমার নিয়েছ বিশ্বের ভার
সুখে আছে সর্ব্ব চরাচর।
মোরে তুমি হে ভিখারী মা'র কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।

কিংবা—

পথে পথে রচি আলিম্পনের রেখা,
পাখার কাঁপনে গগনে গগনে
উচ্ছ্বসি উঠে দিক প্রাঙ্গনে
বহ্নি চক্র লেখা,
প্রথম পরম বাণী—
বীণা হাতে বীণাপাণি!

কিংবা—

এসো গো শারদ লক্ষ্মী তোমার
শুভ্র মেঘের রথে—
এসো নির্ম্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল
আলো ঝলমল
বন গিরি পর্ব্বতে।

এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির ঢালা।

কিংবা—

প্রলয় নাচন নাচলে যখন
আপন ভুলে—
হে নটরাজ নটরাজ
জটার বাঁধন পড়লো খুলে!
জাহ্নবী তায় মুক্তধারা,
উন্মাদিনী দিশেহারা,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গ দোল
উঠলো দুলে!

এই কবিতাংশ গুলির ভেতর দিয়ে যে কবি-দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই, তা ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকের দৃষ্টি নয়—তা লীলাবাদী পৌত্তলিকের দৃষ্টি এবং এ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সহজাত। জন্মভূমিকে তিনি দেখেছেন অন্নপূর্ণা রূপে—

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্যপীযুষ স্তন্যবাহিনী।

ঘনান্ধকার অমারাত্রিকে তিনি দেখেছেন রক্তবীজ বধে নিরত উন্মাদিনী কালিকা রূপে—

আঁধার কুন্তল তোর মহাশূন্য জুড়িয়া,
প্রলয়ের কালো ঝড়ে বেড়াইবে উড়িয়া,
অন্ধকারে দিশাহারা কম্পমান গ্রহতারা
চরণের তলে আসি ভেঙে যাবে গুঁড়ায়ে,
দিবি সেই বিশ্ব-চূর্ণ নিশ্বাসেতে উড়ায়ে !

তাঁর এই পৌত্তলিকতা সব চেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে প্রেমকাব্যে, যেখানে সমস্ত পটভূমিকে অধিকার করে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম পরিকল্পনা—বৈষ্ণবীয় মধুর ভাবের সেই কবিতাগুলিকে অবশ্য খৃষ্টীয় প্রেমকাব্যের প্রেরণা সঞ্জাত বলেও ব্যাখ্যা করা যায়—কিন্তু বহু স্থানে কবি প্রকাশ্য ভাবে কৃষ্ণ-কাহিনীর অবতারণা করে, সেই সন্দেহের নিরসন করে দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে তা অনাবশ্যক।

এথেকে এ কথা অসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক হিন্দু ছিলেন—সেই সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন বা মরমী ছিলেন বা খৃষ্টান ছিলেন। এমন কি প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ-শক্তি আরোপ করে বা সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তির অনুপূরক রূপে জীবনের ব্যাখ্যা করে, তিনি যে আর একটি দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে তাঁকে নিরীশ্বরবাদীও বলা কঠিন নয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ কবির চিত্তে নানা সময়ে নানা সংস্কৃতিরই প্রভাব এসেছে—অনেক সময় একের সঙ্গে তার অন্যের প্রত্যক্ষ কোন যোগও হয়ত থাকেনি—কিন্তু

অনুভূতির গভীরে সব শুদ্ধ জড়িয়ে একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়েছিল—সেই সমন্বয়ই হল তাঁর ধর্ম্মতত্ত্বের গোড়ার কথা।

কিন্তু ধর্ম্মমত এক জিনিষ, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ আর এক জিনিষ। এই প্রয়োগের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে সমাজ-জীবন এবং তা থেকেই এসেছে প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ। ধর্ম্মের এই প্রত্যক্ষ বা ফলিত অংশ যেটা, সাধারণের কাছে তা-ই ধর্ম্ম বলে গৃহীত। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন এবং অভিমত কি ছিল, সেটা এখানে বলা দরকার। আমরা আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবতা বোধের সমর্থক ছিলেন—কাজেই মানুষে-মানুষে ভৌগলিক, ধর্ম্মনৈতিক বা সামাজিক ভেদকে তিনি স্বীকার করতেন না। মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা, মূর্ত্তি, ফলক গ্রন্থ—সব কিছুর সার্থকতাই তিনি স্বীকার কবতেন, মানুষের নৈতিক বিশুদ্ধি ও চারিত্রিক উন্নয়নের জন্যে এদের উপযোগিতাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই অনুমোদনও করতেন, কিন্তু তাঁর মত ছিল যে এই সমস্ত জিনিষ হল লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপ-লক্ষ্য মাত্র—এদেরকেই যেন চরম বা পরম বলে মনে না করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাস্তব জীবনে আমরা তাই করি—তাই পান-ভোজন, আদান-প্রদান, ছোঁয়া-নাড়া আর যা-কিছু সামাজিক ব্যাপার, তার মধ্যে আমরা এদের টেনে আনি এবং এদের আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক গুলো নিয়ে পরস্পর হানাহানি করে মরি। রবীন্দ্রনাথের মতে এ ধর্ম্ম নয়—মানুষের যা ধর্ম্ম, তা হল মহৎ, তা হল কল্যাণপ্রদ, তা হল সর্ব্ব

মানবের মধ্যে একত্ব স্থাপনের উপায়ভূত। সমস্ত উপধর্ম্মই জন্মেছে সেই আদি ও অকৃত্রিম ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে--- কিন্তু বিবেচনাহীন মূঢ়তা ও কুসংস্কারের উৎপাতে তা ক্রমে ক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছে কতকগুলি সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত স্বার্থ স্বরূপ এবং তারি প্রভাবে সমাজ-জীবন হয়েছে বিপর্য্যস্ত। এজন্যে তিনি যত আঘাত করেছেন খৃষ্টানকে, তত আঘাতই করেছেন হিন্দু মুসলমানকে—যদিও প্রত্যেকটি ধর্ম্ম সম্বন্ধেই তাঁর অন্তরে ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ এবং তিনি প্রত্যেকটিকেই অনুসরণ করেছিলেন তাঁর ভাব-জীবনে।

—৫—

সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এত স্বল্প পরিসরে বুঝিয়ে বলা অসম্ভব ব্যাপার, আর তার সার্থকতাও বিশেষ কিছু আছে কিনা সন্দেহ। কারণ তাঁর সাহিত্যিক মতামত অল্প-বিস্তর সকলেরই জানা। বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধে, বক্তৃতায় ও চিঠিপত্রে তিনি এ নিয়ে আলোচনা করেছেন, অন্যান্য লেখকও তাঁর সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে অনেক নূতন আলোক সম্পাত করেছেন। তবু আমাদের এই নিবন্ধের সমগ্রতার জন্যেই সে সম্বন্ধেও দু-একটি কথার অবতারণা করা আবশ্যক।

সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই সাম্প্রতিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপকরণ মনে করতেন না, বা সাময়িক চিত্ত-বিনোদনই

তার একমাত্র লক্ষ্য বলে স্বীকার করতেন না। তিনি মনে করতেন, সাহিত্য হচ্ছে মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত্তের সৃষ্টি, মানুষের সর্ব্বোত্তম অনুভূতির প্রকাশ—তার অবলম্বন হল সৌন্দর্য্য, সত্য, আনন্দ, তা কোন বিশেষ দেশের সঙ্কীর্ণ সীমায় বা বিশেষ সময়ের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মানুষের পক্ষে যা সত্য, সেই শাশ্বত সত্যের ওপরই সাহিত্যের স্থিতি-সাহিত্য কোন নির্দ্দিষ্ট মতবাদেব দাসত্ব করতে পারে না, কোন বিশেষ দেশ ও জাতির ধর্ম্ম, রাজনীতি বা সমাজকে আশ্রয় করে যদিও তার জন্ম, তবু তার লক্ষ্য নির্ব্বিশেষ ভাবে সমস্ত মানুষ। তাই তাকে প্রচার, প্রপাগ্যাণ্ডা বা উদ্দেশ্যের বাহন করে তোলা চলে না—করলে তার আবেদন হয় সাম্প্রতিক এবং সমসাময়িক সমাজেব মনোরঞ্জন বা প্রয়োজন সাধন করেই একদিন তা অন্তর্হিত হয়ে যায় মানুষের ইতিহাস থেকে। বিশ্ব সাহিত্যের স্থায়ী কীর্ত্তি যেগুলি, তা চিরদিন বেঁচে আছে শুধু তাদের অবলম্বিত সত্যের জোরে এবং সে সত্য সমস্ত মানুষের কাছেই সমান অর্থবান।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে সুপরিচিত আদর্শবাদেরই পুনরুক্তি স্বরূপ। এই মত অনুসারে মানুষের মন হল একটি অপরিবর্ত্তনীয় জিনিষ—যুগে যুগে বাস্তব অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, জীবন-যাত্রার আদর্শ বদলায় নানা উপকরণের উদ্ভাবন ও আবিষ্কৃতির ফলে, কিন্তু হৃদয়ের যে সমস্ত বৃত্তির জন্যে মানুষ মানুষ, তা সর্ব্বকালেই থাকে এক।

এই জন্যে যা সুন্দর, যা মহৎ, যা বিচিত্র, যা আনন্দ-বেদনায় চির অম্লান, তার কোনদিন পরিবর্ত্তন নেই—যুগে যুগে বদলায় তার নির্ম্মোক, কিন্তু সমস্ত বহিরুপাদানের আড়ালে যে প্রাণ-বস্তু, তা থেকে যায় চির-অবিকৃত। আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহ, জন্ম-মৃত্যুকে মানুষ চিরদিন দেখেছে একই চোখে—বিশ্বের শোভা-সৌন্দর্য্য, শক্তি-সমৃদ্ধি মানুষকে চিরদিনই ভাবিয়েছে এক রকম করে। জননীর স্নেহ, প্রিয়ার প্রণয়, প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ মানুষ গ্রহণ করেছে চিরদিনই এক রকম অনুরাগে। এই জন্যেই বাল্মীকি-ব্যাস, হোমর-এস্কিলিস, হাফেজ-কালিদাস চিরদিনের কবি, সমস্ত মানুষের কবি। বিদেশী কবি বলেছেন—

Nothing is new
Each age hath a story as old as the sun's—
The flower of to day
Is but a repetition of yesterday's bloom.
O novelty,
You unmeaning hoax…

এই আদর্শবাদের অনুসরণেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য থেকে প্রত্যক্ষতার দাবী নাকচ করার পক্ষপাতী ছিলেন। এর মানে এই নয় যে তিনি তাঁর সাহিত্যিক আদর্শকে সংস্থাপিত করেছিলেন হাওয়ায় ওপর। তিনি বাস্তবকে স্বীকার করেই নিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবের ওপর অত্যুগ্র কল্পনার প্রয়োগ করে, তাকে তিনি বস্তু-সীমার ঊর্দ্ধে নিয়ে যাবার সমর্থক

ছিলেন। তাঁর মতে বাস্তবের স্থান হল রস-সৃষ্টির পশ্চাৎ ভাগে, পুরোভাগে ফুটে ওঠা উচিত রচয়িতার ভাব-সত্ত্বার রূপ। তাঁর লিরিক কবিতার ও গল্প-নাটকের অপরিসীম ভাবমুখিতা এবং প্রত্যক্ষ সংস্রবহীনতা, যা এ-কালে বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় হয়েছে, তাঁর আদর্শ অনুযায়ী তা-ই খাঁটি জাতের সাহিত্য। অবশ্য তিনি নিজে কোন দিন এ কথা বলেছেন তা নয়—কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে মূল-নীতি তাঁর সমালোচনা-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, তা ধরে বিচার করেই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়।

কিন্তু মার্ক্সিষ্ট আদর্শ অনুসারে ব্যাখ্যা করে এই মতবাদ অনেকে সমর্থন করেন নি। তাঁরা বলেন যে মানুষের মন একটা আট-ঘাট-বাঁধা **Concrete** জিনিষ নয়—তা হল কতকগুলি বৃত্তি ও সংস্কারের সমষ্টি এবং সে সংস্কারের জন্ম বাস্তবের সঙ্গে সঙ্ঘাত থেকে। বাস্তবে নূতন নূতন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার যতই জীবন-যাপনের আদর্শ ও পারিকল্পনায় পরিবর্ত্তন আনে, ততই (তাদের ওপর নির্ভরশীল) মনোবৃত্তির প্রকৃতি ও পদ্ধতি যায় বদলে। সভ্যতার আদিতে প্রকৃতিকে মানুষ যে চোখে দেখেছিল, আজকের বিজ্ঞান-বুদ্ধি-সমৃদ্ধ মানুষও তাকে সেই চোখেই দেখে না—জীবন-রহস্যের বিভিন্ন দিককে পুরানো মানুষ যে ভাবে বুঝেছিল, দর্শন ও মননের উন্নততম স্তরে এসে আজো মানুষ তাই বোঝে না। এমন কি এঁরা বলেন যে দয়া

মায়া প্রেম বিরহ শোক দুঃখ প্রভৃতি যে সমস্ত সংস্কারকে আমরা শাশ্বত বলে মনে করি, সেও অপরিবর্ত্তিত সমাজ-ব্যবস্থার ভেতর পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ হয়ে থাকার ফল। যদি এই সমাজ-বিধান পাল্টে ফেলা যায় এবং নূতন করে শৈশব থেকে মানুষকে নূতন সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে গড়ে তোলা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এজিনিষগুলোও আরোপিত। এই জন্যেই এঁরা পূর্ব্বোক্ত আদর্শবাদকে স্বীকার করেন না—বা সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি সেই অনুসারে বেঁধে দেওয়ারও সমর্থন করেন না।

এঁরা বলেন যে সাহিত্য হবে বাস্তব আবেষ্টনী থেকে আহৃত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা গুলির সুষ্ঠু বিন্যাস—আর তার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে তার জীবন ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ করে তোলা, তাকে চিন্তা ও মননের ভেতর দিয়ে সৃষ্টির প্রেরণা জোগানো। সে সৃষ্টি এঁদের মতে বাস্তব সংসারের চতুঃসীমাতেই আবদ্ধ—এর বাইরে অপার্থিব কোন কল্প-লোককে এঁরা স্বীকার করেন না। তাই সৌন্দর্য্য, প্রশান্তি ও বিশ্ব-কল্যাণের নামে বস্তুকে এড়িয়ে লোকোত্তর রস-সৃষ্টির প্রয়াসকে এঁরা নিন্দনীয় মনে করেন। এঁরা বলেন, পরশ্রমজীবী বুর্জ্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে—দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা, সৌন্দর্য্যবাদ প্রভৃতির সাহায্যেই তার অধিকার কায়েম রাখার চেষ্টা হয়ে থাকে। আদর্শবাদী সাহিত্য সেই কায়েমি স্বার্থেরই একটা বৃহৎ

আনুষঙ্গিক বলে এঁদের বিশ্বাস। এঁরা তাই মনে করেন যে যে বিবর্ত্তনের ধারায় সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আদি ও মধ্য যুগের ভেতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌছেছে, তা মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মতোই সাহিত্যকেও নূতন করে গড়ে তোলার প্রেরণা দিয়েছে। সেই প্রেরণা হল গণ-সাহিত্য রচনার—যাতে আনতে হবে শ্রেণীহীন সমাজ-গঠনের আদর্শ। অর্থাৎ এ-কালের সাহিত্য নিছক রস-সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত থাকবে না, তাকে হতে হবে অন্যান্য উৎপাদন মূলক শ্রমের সামিল এবং সেই জন্যেই তাকে করতে হবে বাস্তবের আনুগত্য।

বলা অনাবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথ এই মতকে স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, তত্ত্ব, তথ্য, মত, মন্তব্য, যাই কেন না আসুক সাহিত্যে—তা হল গৌণ, সাহিত্যের মুখ্য বস্তু হল রস এবং সে রসের স্থিতি বাস্তবের ওপর হলেও গতি বাস্তবাতীতের দিকে। কাজেই সাহিত্যের প্রসঙ্গে কোন সে-কাল এ-কালের প্রশ্ন উঠতে পারেনা—ওর আদর্শ চিরদিনকার, গণ-সাহিত্য বা শ্রেণী-সাহিত্য বা আর যে-কোন রকম শ্রেণী বিভাগের দ্বারাই সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হক, সাহিত্য এক অখণ্ড বস্তু—তার এলাকাও দিগন্ত বিস্তৃত। কাজেই শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা সাম্নে নিয়ে যা লেখা হয়, শুধু তাই সাহিত্য নয়, শ্রেণী-স্বার্থের সমর্থন করেও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয়। এতকাল তাই হয়েছে, বরং তথকথিত গণসাহিত্যই এখনো-তার প্রাণশক্তির

দিয়ে জয়যুক্ত হয় নি। তিনি বলেন, পলি মৃত্তিকা

কোন স্থায়ী কীর্ত্তির ভিত বহন করতে পারেনা—অর্থাৎ কেবল মাত্র শ্রমজীবীই যুগ-সংস্কৃতি সর্ব্বাঙ্গীণ প্রতিভূ হয়ে উঠতে পারে না।

এটা অবশ্য তর্কের বিষয় এবং এ তর্কের দু-কথায় মীমাংসা হওয়াও কঠিন। তবে কবির এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্যে 'বিষয়' বড় জিনিষ হলেও, প্রকাশ-ভঙ্গী তার চেয়েও বড় জিনিষ—কারণ তাই জড় বিষয়কে শিল্পের স্তরে উন্নীত করে, আর এই ভঙ্গী জিনিষটার বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য উপলব্ধিও সর্ব্বসাধারণের ক্ষমতার বাইরে। কাজেই সাহিত্যের অবলম্বন যাই হক, আবেদন কোন দিনই সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারবেনা—তাকে বিদ্বৎসমাজের মুখ চেয়েই বাঁচতে হবে, আর বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় বিদ্বৎসম্প্রদায়ের অনেকেই হয় বুর্জ্জোয়া, নয়ত তাঁদের স্বার্থবাহী—সুতরাং উপায় কি? তাই রবীন্দ্রনাথের যুক্তি যে যোল-আনা অপ্রনিধানযোগ্য নয়, তা স্বীকার করতেই হবে। তাঁর স্বকীয় সাহিত্যর কথাই ধরি—তাঁর অলঙ্কার বিন্যাস ও শব্দ-প্রয়োগের নৈপুণ্য কি এমন উচ্চ গ্রামের নয়, যা গণসাধারণের বোধ-শক্তির বাইরে?

—৬—

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মতামত সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই আমরা কিছু আলোচনা করেছি—এখানে আরো কয়েকটি কথা বলবার চেষ্টা করবো। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলদের মতোই

রবীন্দ্রনাথেরও জগৎ, জীবন এবং পরমার্থ সম্বন্ধে নিজস্ব কতকগুলি মতবাদ ছিল—এই মতবাদ গুলির আলোতেই তাঁর দার্শনিকতার বিচার করতে হবে। কাণ্ট বা হেগেল যে হিসাবে দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ যে সে হিসাবে দার্শনিক নন, এ কথা আশা করি সকলেই জানেন। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে দৃষ্টি ও অনুভূতি—যার অনুপ্রেরণায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যকে, তাই হল তাঁর দর্শন। বস্তুতঃ এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে যদিও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা···সব কিছু নিয়েই চূড়ান্ত আলোচনা করেছেন, তবু তিনি প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ কবি—তাঁর কবি-মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল অনুভূতি ও কল্পনার ভেতর দিয়ে সমস্ত ব্যাপারকে দেখা, আর সেই দেখার ঐশ্বর্য্য অন্যের সাম্নে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়া। এই জন্যে তাঁর নানামুখী মত ও চিন্তার মধ্যেই দৃষ্টিগত একটি বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যই হল তাঁর দর্শনের আদি-সূত্র।

রবীন্দ্র দর্শনের এই আদি-সূত্রটি কি ? আগেই বলেছি যে জগৎ, জীব ও পরমার্থ এই তিনের স্বরূপ ব্যাখ্যান, এবং এদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয়ই হল সমস্ত দর্শনের উপজীব্য (অবশ্য সমস্ত আস্তিক্যবাদী দর্শনের এবং রবীন্দ্রনাথ আস্তিক্যবাদীই), রবীন্দ্রনাথের দর্শনেও এই তিনেরই ব্যাখ্যান এবং বিশ্লেষণ দেখতে পাই। একে একে এদের কথা বলি।

প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অখণ্ড প্রাণ-শক্তির মূলাধার রূপে—ক্ষুদ্রতম প্রাণ-কণিকা থেকে আরম্ভ করে, বৃহত্তম জৈবসত্তা পর্য্যন্ত সমস্তই সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তির ধারায় উৎসারিত হয়েছে এই আদি জীবন-ভূমি থেকে। প্রকৃতির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর মধ্যে দিয়ে উদ্বেলিত হচ্ছে যে দুর্নিবার প্রাণ-লীলা—যা বীজ থেকে বৃক্ষে, বৃক্ষ থেকে ফুল-ফলে, তা থেকে আবার বীজে অবিশ্রাম রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে—দিন ও রাত্রির পরিবর্ত্তন, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্তের আবর্ত্তন এই রূপান্তরের পথে আনছে যে নব নব পরিণতির প্রকাশ—একে রবীন্দ্রনাথ একটা মূঢ় শক্তির ক্রিয়া বলে গ্রহণ করেন নি। এর মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন একটি প্রাণময় পরম সত্তার অবস্থিতি, যা নানা খণ্ড-অভিব্যক্তির ভেতরেও এক এবং অখণ্ড। এই যে সৃষ্টি প্রপঞ্চ, এই যে এর প্রতি মুহূর্ত্তের ভাঙাগড়া—এ আকস্মিক নয়, যেমন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সহসা-উদ্ভূত একটা বিচিত্র বস্তু নয়। এর পেছনে রয়েছেন নিত্য ক্রিয়াশীল, নিত্য মননশীল সেই পরম প্রাণ সত্তা—তাঁরি নির্দ্দেশে চলছে ফিরছে এই জগৎ—নানা রূপে ফুটে উঠছে, ভেঙে পড়ছে, আবার সেই ধ্বংসের ভেতর থেকেই জেগে উঠছে নূতন জীবনাঙ্কুর—এর শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ একটা লীলা এবং এই লীলাকে তিনি ভাগবতী লীলা রূপেই চিত্রিত করেছেন।

জড়বিজ্ঞান যে evolution-কে স্বীকার করে, তাতেও

প্রাণ-শক্তির এই অফুরন্ত রূপান্তকেই গ্রহণ করা হয়েছে—কিন্তু তার কেন্দ্র-স্থানে রয়েছে একটি মূঢ় কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের খেলা। সেই বিজ্ঞান-সম্মত কঠামোর ওপরই রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্ব-তত্ত্ব সংস্থিত, কিন্তু একে তিনি তাঁর নিজস্ব ভাব-কল্পনায় অভিষিক্ত করে নূতন একটি দর্শনিক মতবাদে পরিণত করে নিয়েছেন। এই মতবাদকে অনেকে বার্গসঁ প্রবর্ত্তিত Creative evolution-এর সগোত্রীয় বলে মনে করেছেন—কেউ বা বলেছেন যে এর মূল হল শেলীর কাব্য। অনেকে আবার এর ভেতর উপনিষদের ছায়াও লক্ষ্য করেছেন। বস্তুতঃ এ তিনেরই সঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শনের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু তাই বলে একে অনুকৃতি বা অনুসরণ বলা যায় না। প্রকৃতির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে ব্যাপ্ত করে বলে চলেছে অখণ্ড একটি প্রাণের খেলা এবং তা নিরুপাধিক কোন বৈদ্যুত-চেতনার খেলা নয়—সে হল চিরসুন্দর, চিরমঙ্গল, চিরধ্রুব এক পরমাত্মার লীলা, যে লীলা স্থূল রূপে প্রকট এই বিচিত্র জগৎ ব্যাপারের ভেতর দিয়ে, আবার সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত এর অন্তর্নিহিত গঠন ক্রিয়ায়—এ মত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নয়, কিন্তু এই মতকে তিনি যে নূতন ব্যঞ্জনা দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন, তা তাঁরি সৃষ্টি এবং সেইখানেই তাঁর নিজস্বতা।

আমাদের সসীম জীবন ও তার অন্তর্লগ্ন সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, জন্ম-মৃত্যুকে তিনি তাই চরমাবস্থা বলে গণ্য করেন নি। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে বেষ্টন করে আবর্ত্তিত হচ্ছে যে

অসীম প্রাণ-লীলা, এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিকাশ, এ তাঁর মতে সেই অপার প্রাণ-সমুদ্রের বুকে ফুটে-ওঠা এক-একটা বুদ্বুদের মতো—যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই আছে তাদের আত্মস্বতন্ত্র অস্তিত্ব, কিন্তু যেই ভেঙে যাচ্ছে, অম্নি তারা বিলীন হয়ে যাচ্ছে সেই বিরাট প্রাণ-স্রোতে। কাজেই যখন তিনি প্রেম সঙ্গীত রচনা করেছেন, যখন এঁকেছেন মৃত্যুর ছবি, বাস্তব জীবনের বেদনা বঞ্চনা আঘাত অবমাননাকে ভাষা দিয়েছেন, তখন এদের তিনি নির্ব্বিশেষ রূপে উপস্থিত করেন নি—এদের পেছনে রয়েছে যে অম্লান সার্থকতা, অপূর্ব্ব সম্পূর্ণতা, তার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়েই তিনি এই আপেক্ষিক অভিব্যক্তি গুলিকে রূপায়িত করেছেন। তাই আমাদের বৈষয়িক দৃষ্টিতে দেখলে, অনেক সময় মনে হতে পারে যে বাস্তব জীবনকে তিনি তার প্রত্যক্ষ আবেষ্টনী থেকে বিছিন্ন করে দেখেছেন—অর্থাৎ বাস্তবতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে সব সময় আমরা সহজ মনে নিতে পারি কি না সন্দেহ!

কিন্তু এইখানে বলে রাখা দরকার যে বাস্তব সংসার এবং তার প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, আঘাত-সঙ্ঘাত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সজাগ অভিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব ছিল না। চরম সত্য ও পরম ঐক্যের দিক থেকে বিচার করলে এদের স্বরূপ যাই হক, নিজস্ব ভাবে এরা মিথ্যা নয়—মানুষের কাপট্য, স্বার্থপরতা, ইতরতা, ঈর্ষা বা আর যা-কিছু অসৎবৃত্তি সমাজ-জীবনে এনেছে অনৈক্য ও অশান্তি, তিনি তার বিরুদ্ধে উদাত্ত কণ্ঠে

প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন, এমন কি বিদ্রোহ ঘোষণাতেও পেছপা হননি—জরা, মৃত্যু, ক্লৈব্য, অক্ষমতা যেখানে জীবনের স্বাভাবিক গতির ও সহজ মুক্তির পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে, সেখানে তিনি দিয়েছেন সাহস ও সহানুভূতির, শান্তি ও সাম্যের আহবান। বৈদান্তিক নির্লিপ্ততায় তাবৎ পার্থিব ব্যাপারকে মায়া মাত্র বলে উড়িয়ে দেন নি তিনি—মানুষের প্রাকৃতিক ও মানবিক দুর্ভাগ্যগুলিকে মানুষের মতোই তিনি গ্রহণ করেছেন এবং এ সবের উর্দ্ধে অবস্থিত যে শাশ্বত সত্যের রাজ্য, তার আশ্রয়ভ্রষ্ট হয়ে মানুষ যে কি ভাবে মানুষের হাতে নিপীড়িত হচ্ছে, তা-ও তিনি অকপট আন্তরিকতার সঙ্গেই অঙ্কিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, মানুষ কি ভাবে তথাকথিত সভ্যতার নামে ক্রমাগত তার লালসাকেই বাড়িয়ে চলেছে একের পর এক উপকরণ সৃষ্টি করে এবং সেই সমস্ত উপকরণের দাসত্বে দিনে-দিনে কি ভাবে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে অন্তরের দিক থেকে নিঃস্ব হচ্ছে। এই যে লালসা, এই যে অন্যকে চেপে রেখে নিজে বড় হয়ে ওঠবার প্রচেষ্টা এবং তার জন্যে সংসার-জীবনের শালীনতা ও শ্রী নষ্ট করা—সমাজে অনৈক্য, অশান্তি ও অত্যাচারকে স্বাগত করে আনা, এ তাঁর মতে তথা-কথিত যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিক্রিয়া। এ বস্তুর সঞ্চয়ে স্ফীত, এতে নেই অন্তরের ঐশ্বর্য্য, তাই একে তিনি বর্জ্জন করতে বলেছেন। বলেছেন, আবার অতীতের সেই ভাব-সমৃদ্ধ

জীবনাদর্শকে জাগিয়ে তুলতে, যাতে থাকবে না উপকরণের বাহুল্য, যা বিস্তার করবে না অশিষ্ট লোভের অনতিক্রমনীয় নাগপাশ। মানুষ তার যন্ত্রবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবে, মুক্তি পাবে কু-অভ্যাস ও কদাচারের দাসত্ব থেকে এবং তার ভেতরকার অমৃতত্ব, বিশ্ব-প্রকৃতির বিচিত্র প্রাণ-লীলার সঙ্গে তার নিত্য ক্রিয়াশীল যোগ-সূত্রটি আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এই হল তাঁর দর্শনের শেষ কথা। এই কথা অনেকর কাছে হয়ত অপ্রগতিশীল মনে হবে—জীবনের বাস্তব পরিণতিকে অস্বীকার করে, রবীন্দ্রনাথ তাকে একটা রোম্যান্টিক স্বর্ণযুগের পটভূমিতে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন বলেও অনেকে হয়ত মনে করবেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

—৭—

সাহিত্য, নৃত্য-গীত ও চিত্রকলার (এক কথায় সমগ্র ভাবে আর্টের) আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত সুবিদিত। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তিনি এদের প্রত্যেকটির তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন—সেই আলোচনায় তাঁর স্বকীয় দর্শনের স্বরূপও যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করেছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের এই ধারাবাহিক আলোচনা থেকে এই প্রসঙ্গগুলি বাদ দেওয়া চলবে না। তাই সংক্ষেপে আরো কয়েকটি কথার অবতারণা করা যাচ্ছে।

সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ মতবাদের বাহন বলে স্বীকার করতেন না—কোন সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ

হিসাবে তার ব্যবহারেরও তিনি সমর্থক ছিলেন না। তাঁর মতে যদিও বাস্তবই হল সাহিত্যের আদি-ভূমি, তবু প্রাত্যহিক বাস্তবকে অতিক্রম করে চিরন্তন সত্য ও সৌন্দর্য্যের স্তরে উন্নীত হওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম—অর্থাৎ বাস্তবের দুঃখ-বেদনা, আঘাত-অবমাননা, ব্যর্থতা-বঞ্চনা, অসঙ্গতি-অনৈক্য, সাহিত্যের আসরে এলেও আসতে পারে, কিন্তু রসের ঐশ্বর্য্যে, কল্পনার সমৃদ্ধিতে, অলঙ্করণের চাতুর্য্যে নিজেদের বস্তু-সীমাকে ছাপিয়ে উঠতে না পারলে, সাহিত্যের অঙ্গণে তারা কখনই জলাচরণীয় হয়ে উঠবে না। যা সুন্দর, যা শাশ্বত, যা আনন্দঘন, তাই হল তাঁর মতে সাহিত্যের আদর্শ, তার উপকরণ যা-ই হক না কেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে-কাল এ-কাল বলে কিছু নেই—যুগে-যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যবহারিক চেহারায় পরিবর্ত্তন হয়, জীবন-যাপনের প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে ওলট-পালট হয়, কিন্তু মানুষের মনোবৃত্তির মৌলিক সূত্রগুলি অবিকৃতই থাকে। তাই প্রাচীন যুগে, মধ্য যুগে, আধুনিক যুগে মানুষের মননক্রিয়ার প্রকৃতি একই রয়ে গেছে। সৌন্দর্য্য বোধ, শুভবুদ্ধি, আসঙ্গলিপ্সা, আর যা-কিছু বোধ্ব জৈববৃত্তির গোড়ার কথা, তার কিছুই বদল হয়নি—এরা শাশ্বত, সেই জন্যেই সত্য ও সুন্দর। একখানি চিঠিতে তিনি কৌতুক করে বলেছেন—'আমরা দেখিয়েছি দুকূল দুলিয়ে বকুল বনে যাবার প্রলোভন, অনুনয় করেছি অলক্ত-রঞ্জিত মঞ্জীর-শিঞ্জিত পদে অনুপ্রাস-মুখর ললিত ছন্দের তালে তালে চলতে। কালধর্ম্মে

ফ্যাসন বদলেছে, তোমরা আজ আমন্ত্রণ করো পার্কে, পরে আসতে বলো শ্লিপার, নয়ত হিলতোলা জুতো এবং গতির মধ্যে তোমরা আনতে চাও ক্ষিপ্রতা। কিন্তু পরিবর্ত্তনটা কোথায়? উদ্দেশ্য সেই একই—এ সকল কালের বড় আদালতেই পেয়েছে আপনার স্বীকারনামা'।

এই দৃষ্টি ভঙ্গীর অনুসরণেই সাহিত্যকে তিনি সাম্প্রতিক রাজনীতি ও সমাজ-কল্যাণের যন্ত্র মাত্র বলে মনে করেন নি। দক্ষিণ-বাম কোন বিশেষ মার্গের দাসত্বে সাহিত্যকে নিয়োজিত করাকেও তিনি সমাচীন মনে করেন নি। তাঁর মতে সাহিত্য হচ্ছে মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুভূতিগুলির প্রকাশ, সে অনুভূতি যে পর্ব্বেরই হক না কেন, এবং সে প্রকাশকে তিনি অলঙ্করণের আভিজাত্যে অভিষিক্ত করে নেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন। এসম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'মত জিনিষটা হচ্ছে সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবদেহের অন্তর্গত কঙ্কালের মতো। ওটা ভেতরে থেকেই সাহিত্যকে জোগাবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি—বাইরে প্রকাশ পাবে তার বিচিত্র দেহসৌষ্ঠব, তার লাবণ্য। কিন্তু বাইরেটাকে আজ মনে করা হচ্ছে অনাবশ্যক, মনে করা হচ্ছে অসার্থক, নিছক কাজের কথা বলাই হয়েছে হাল আমলের লক্ষ্য, আর সে কথা হচ্ছে দরিদ্রের উন্নয়নের কথা। দারিদ্র্য আছে, তার উন্নয়নের দাবীও থাকবে সাহিত্যে—কিন্তু তাছাড়া আর কিছুই কি থাকবে না? সৃষ্টি-চক্রে শুধু পঙ্কটাই গণ্য হবে সত্য বলে, আর পঙ্কজটা হয়ে যাবে মিথ্যা? শিল্পীকে

এইজন্যে হতে হবে সহজ—কোন বিশেষ মতবাদের কাছে যদি তিনি দাসখৎ লিখে দিয়ে বসেন, তাহলে পক্ষপাতের কুয়াসায় তাঁর সত্য-দৃষ্টি হবে বাধাপ্রাপ্ত, তাঁর সাহিত্যও হবে সত্যভ্রষ্ট। এই জন্যেই সাহিত্যের যা সত্য, তা কোন বিশেষ আমলের রাজনৈতিক প্রপাগ্যাণ্ডার লেজুড় ধরে চলতে পারবে না'।

বলা বাহুল্য এখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন আধুনিক বামপন্থী আন্দোলনকে এবং এ আন্দোলনকে তিনি সাহিত্যের দিক থেকে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছেন। তিনি আরো স্পষ্ট করেই বলেছেন একখানি চিঠিতে, 'হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল যে এত দিন যা সুন্দর বলে, মহৎ বলে, সার্ব্বজনিক বলে ধরা হয়ে এসেছে, তা গর্হিত—কারণ তার পেছনে রয়েছে বুর্জ্জোয়া সংস্কৃতির প্রশ্রয়। যারা কায়িক শ্রম করে এবং সেই শ্রমের লভ্যাংশ যারা ভোগ করে, তাদের মধ্যে চিরদিন চলে এসেছে যে বিরোধ, তাকে রাজনীতিক পোষাক পরিয়ে আজ সাহিত্যের আসরে ডেকে আনা হচ্ছে—বলা হচ্ছে, এই বিরোধের নিষ্পত্তিই হল আধুনিক সাহিত্যের লক্ষ্য। এর বাইরে আর যা-কিছু রইলো, যেহেতু তা কায়িক শ্রমে যারা জীবিকাহরণ করে তাদের প্রয়োজনের বা আয়ত্তের বাইরে, সেই জন্যেই তার উচ্ছেদ প্রয়োজন।...বেশ কথা, তাহলে ধর্ম্ম থাকবার দরকার নেই, শিল্প-সাহিত্যই বা থাকবে কেন?'

কবির শেষ কয় বৎসরের প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে এই কথাটা বার বারই নানা আকারে প্রকাশ পেয়েছে।. বলা অনাবশ্যক

যে সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর যা অভিমত, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে তা চমৎকার ভাবেই রূপায়িত হয়েছে এবং তার মহিমাও আমরা পূর্ণভাবেই হৃদয়ঙ্গম করি। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মননধারার মৌলিক অপরিবর্ত্তনীয়তাকে (যার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মতবাদ) ইদানীন্তন সমালোচকরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আসে জীবন-যাপনের মান এবং উপকরণ বদলালে এবং সেই পরিবর্ত্তন অজ্ঞাতসারেই আমাদের সংস্কার ও ধারণার রাজ্যে ওলট-পালট ঘটায়। তবু যে আমরা ভূতপূর্ব্ব সংস্কার ও মতবাদের জের টেনে চলি, সে শুধু সমাজ-সংস্থানের আদি-কাঠামোটা বদলানো যায় নি বলেই। যদি এই প্রাকব্যাবস্থিত সমাজ ও তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানকে আমূল ঢেলে সাজা যায়, তাহলে তার আশ্রয়চ্যুত হয়ে সমস্ত সমাজ-চেতনাই বদলে যাবে। সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখানো হয়। পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে, ধর্ম্ম নিয়ে, আর্ট নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করেছেন এবং তাতে সাফল্যও লাভ করেছেন। আমাদের সাহিত্য থেকেও যদি শ্রেণীস্বার্থকে বা তার পরিপোষক আদর্শবাদকে কোন দিন বিতাড়িত করা যায়, তাহলে তাতে ভয়ের কিছু নেই হয়ত। কিন্তু যে সমাজ-ব্যবস্থার মাতৃস্তন্য থেকে জন্মাবে সেই নূতন সাহিত্য-বোধ, তার আবহাওয়া কোথায় ? সমাজে চলছে এখনো মধ্য যুগ—ধর্ম্মে, আচারে-অনুষ্ঠানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্ব্বত্রই চলছে তারি

দাপট-তাকে বদলাতে হলে চাই রাশিয়ারই মতো বিপ্লব। কিন্তু সে বিপ্লব দানা বাঁধবে কৌলিক ও ভৌমিক একাধিকার ভেঙে তাব স্থানে ব্যাপক শ্রম-শিল্পের প্রসার হলে—মাঝখানকার ধাপগুলিকে টপকে শেষ ধাপে পা নেবার চেষ্টা করছি আমরা, তাই আমাদের বামপন্থী আন্দোলন আজো জীবন থেকে উৎসারিত হয় নি। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ কিছুমাত্র অমূলক নয়।

সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করবো। গানে সুরের আসন যে উঁচুতে রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করতেন, কিন্তু কথাকে তাই বলে তিনি সুরের বাহন মনে করতেন না। সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করেও গানের কথা আত্মস্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে উপভোগ্য নয়, এমন গান রবীন্দ্রনাথ নিজে কোন দিন লেখেন নি। তাঁর সঙ্গীত গাইলে গান, পড়লে কবিতা। গান ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাণ-ধর্ম্মী, সুর তাঁর মতে সেই প্রাণ-বস্তুর পরিপোষক। তাই নিছক সুরের আলাপকে তিনি নির্ব্বিশেষ কণ্ঠ-ক্রিয়া বলে মনে করতেন। অর্থাৎ গানে তিনি ক্ল্যাসিক পন্থী ছিলেন না, ছিলেন রোমান্সপন্থী। নিজে তিনি ক্ল্যাসিকাল সুরের গান বড়-একটা লেখেন নি, পক্ষান্তরে কীর্ত্তন, ভাটিয়াল, বাউল প্রভৃতি খাস বাংলা সুরকেই দিয়েছেন প্রাধান্য। তথাকথিত হিন্দুস্থানী গান সম্বন্ধে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট এবং সে মতামত নিয়ে তর্কও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তাঁর স্বরচিত গান নিয়ে

যাঁরা বিচার করবেন, তাঁরা সহজেই এই তর্কের সমাধানে পৌঁছুবেন।

গানের মতো নৃত্যেও তিনি প্রাণ-ধর্ম্মেরই সমর্থক ছিলেন। নানা ভাব ও বৃত্তির সঙ্ঘাতে মানুষের হৃদয়-রাজ্যে নিত্য-নিয়ত চলছে যে আরোহ-অবরোহের খেলা, তাকে দেহ-ভঙ্গীর ভেতর দিয়ে রূপায়িত করাই হল তাঁর মতে নৃত্যের আদর্শ। দেহ-ভঙ্গীকে তিনি নৃত্যের ভাষা বলে মনে করতেন এবং দেহ-বিন্যাসে ছন্দ-সঙ্গতি, মুদ্রা, মাত্রা ইত্যাদির অন্তর্মুখিতাই হল তাঁর মতে অভিজাত নৃত্যের কুল-লক্ষণ। শান্তিনিকেতন 'স্কুলের' যে নৃত্য তিনি প্রবর্ত্তন করেছেন, তার মুল আদর্শ এই। এই আদর্শ অনুসারে বিচার করলে অধিকাংশ পাশ্চাত্য নৃত্যই নিতান্ত স্থুল —তাতে দেহের ব্যবহারিক বিন্যাসই প্রধান, রসের অন্তর্মুখী আবেদন প্রায় নেই বললেই চলে।

কিন্তু নৃত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন একান্ত ভাবে প্রাচ্য-আদর্শের পরিপোষক, চিত্রাঙ্কণ ক্ষেত্রে তেমনি ছিলেন প্রাচ্য-রীতির একান্ত বিরোধী। তাঁর মতামত অবশ্য অবনীন্দ্র-নাথ নন্দলাল প্রমুখ প্রাচ্য স্কুলের শিল্পীদের অবলম্বিত অঙ্কণ রীতির অনুকূলে ছিল—কিন্তু তিনি নিজে যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন (সংখ্যায় তা প্রায় দেড় হাজার), তাতে একেবারে ইউরোপীয় অতি-বাস্তবিক (Sur-realistic) অঙ্কণেরই প্রতিচ্ছবি দেখি। পিকাসোর কতক ছবির সঙ্গে তাঁর ছবিগুলিকে সহজেই মিশিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য পিকাসোর অঙ্কণ-রীতির

পেছনে ছিল তাঁর নিজস্ব একটি Philosophy—আর রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ চিত্রশিল্পী ছিলেন না বলে এজন্যে ছিল তাঁর একটা মৃত্নু কৈফিয়ৎ।

চিত্রাঙ্কণকে তিনি বিধিবদ্ধ অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করেন নি—স্নুতরাং অঙ্কণের যে গ্রামার, তা ছিল তাঁর অজ্ঞাত। ভেতরকার স্বজনী মনের তাগিদেই তিনি তুলি চালনা করেছেন, তা নিজের খেয়ালেই সৃষ্টি করে গেছে নানা 'রূপ'—যা কখনো হয়েছে বাস্তবের প্রতিরূপ, কখনো বা তাঁর মনের। কেতাবী মতে ছবির পরিপ্রেক্ষণী, আঙ্গিক সংস্থান বা বর্ণগত কারিকুরি নিয়ে বিচার করলে তাই তাঁর সব ছবি ধোপে না টিঁকতে পারে—কিন্তু ছবির প্রাণ-বস্তু যা, তা তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতেই আছে।

রবীন্দ্রনাথের এই কথাই পিকাসো-পন্থীরাও বলেছেন, তবে একটু ঘুরিয়ে। তাঁরা বলেন, সাহিত্যে বা শিল্পে আমরা ভাব প্রকাশ করি যে ভাষায়, সে ভাষা অভ্যস্ত বলেই তার অসম্পূর্ণতা আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু আসলে মনের প্রতিরূপ অঙ্কণে এরা বড়ই অপটু বাহন। মনের অবচেতন পর্দ্দায় কোন জিনিষই পরস্পরসম্বদ্ধ হয়ে নেই—সবই আছে একে অন্যের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে। তাই বাইরের একটা কোন ইঙ্গিত বা উদ্দীপনায় মনের ভেতর যখন কোন সৃষ্টি রূপ পরিগ্রহ করে, তখন তা সমগ্র ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ চেহারা নিয়ে গড়ে ওঠে না—অনেক কিছু খণ্ড-চিত্রের সঙ্গে জড়িয়েই তা হয়ে ওঠে একটা অখণ্ড অসংলগ্নতা। তাই আর্টে মনের যে রূপটি প্রকাশ পায়, তা

অসত্য—বাইরে থেকে তৈরী-করা একটা Convention-এর আনুগত্য করতে করতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি বলেই তার কৃত্রিমতা আমরা ধরতে পারি না। এঁরা বলেন, খাঁটি জাতের আর্ট সৃষ্টি করতে হলে এই কৃত্রিমতার হাত এড়াতে হবে—অবচেতনাকে দিতে হবে শিল্পের মধ্যে রূপ। এজরা-পাউণ্ড, কাম্মিংস প্রভৃতি কবিরা এবং পিকাসো, বেকম্যান প্রমুখ চিত্রশিল্পীরা তাঁদের রচনায় এই মতবাদকে অনুসরণ করেছেন—তাঁদের সৃষ্টিতে যে দুর্বোধ্যতা দেখা যায়, তা এই জন্যেই। সাহিত্যে এই অবচেতনার অভ্যুদয়কে রবীন্দ্রনাথ আদৌ সমর্থন করেন নি—বাংলা দেশে এই দিক থেকে যে আন্দোলন হয়েছে, তিনি তাকে নিন্দা এবং বিদ্রূপই করেছেন বরং। কিন্তু চিত্রাঙ্কণের ব্যাপারে তিনি নিজেই এই মতবাদের অনুসরণ করেছেন। তাঁর ছবিগুলি অবচেতনারই প্রতিফলন—তাই বাইরে তাদের সঙ্গতি বা সুষমা সব সময় সুলভ নয়।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত পুস্তকের সময়ানুক্রমিক তালিকা

১৮৭৮—কবি কাহিণী (উপাখ্যান কাব্য)

১৮৮০—বনফুল (কাব্য)

১৮৮১—বাল্মীকি-প্রতিভা (গীতিনাট্য), ভগ্নহৃদয় (কাব্যনাট্য) রুদ্রচণ্ড (কাব্যনাট্য), ইউরোপ প্রবাসীর পত্র (ভ্রমণ কাহিনী)

১৮৮২—সন্ধ্যা সঙ্গীত (কবিতা), কাল মৃগয়া (গীতি নাট্য)

১৮৮৩—বৌঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস), প্রভাত সঙ্গীত (কবিতা), বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ সংগ্রহ)

১৮৮৪—ছবি ও গান (কবিতা), প্রকৃতির প্রতিশোধ (নাট্য কবিতা), নলিনী (গদ্যনাট্য), শৈশব সঙ্গীত (বাল্য কবিতা সংগ্রহ), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (বৈষ্ণব কবিতা)

১৮৮৫—রামমোহন রায় (জীবন আলোচনা), আলোচনা (প্রবন্ধ), রবিচ্ছায়া (গান সংগ্রহ)

১৮৮৬—কড়ি ও কোমল (কবিতা)

১৮৮৭—রাজর্ষি (উপন্যাস), চিঠিপত্র (প্রবন্ধ)

১৮৮৮—সমালোচনা (প্রবন্ধ), মায়ার খেলা (গীতিনাট্য)

১৮৮৯—রাজা ও রাণী (নাট্য কাব্য)

১৮৯০—বিসর্জ্জন (নাটক), মন্ত্রী অভিষেক (রাজনৈতিক পুস্তিকা), মানসী (কবিতা)

১৮৯১—ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী (১ম খণ্ড—ভ্রমণ)

১৮৯২—চিত্রাঙ্গদা (নাট্যকাব্য) গোড়ায় গলদ (প্রহসন)

১৮৯৩—গানের বহি (গান সংগ্রহ), ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী (২য় খণ্ড—ভ্রমণ)

১৮৯৪—সোনার তরী (কবিতা), ছোট গল্প (গল্প সংগ্রহ), বিদায়-অভিশাপ (নাট্য কবিতা), বিচিত্র গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড—গল্প সংগ্রহ), কথা চতুষ্টয় (গল্প সংগ্রহ)

১৮৯৫—গল্পদশক (গল্প সংগ্রহ)

১৮৯৬—নদী (বর্ণনাত্মক কাব্য), চিত্রা (কবিতা), সংস্কৃত শিক্ষা (১ম ও ২য় খণ্ড—পাঠ্য পুস্তক), কাব্য গ্রন্থাবলী [এই খণ্ডে অপ্রকাশিত মালিনী নাট্য ও চৈতালী কবিতা সংগ্রহ সংযোজিত হয়]

১১৯৭—বৈকুণ্ঠের খাতা (প্রহসন), পঞ্চভূত (দার্শনিক প্রবন্ধ)

১৮৯৯—কণিকা (নীতি কবিতা)

১৯০০—কথা (গাথা কবিতা), কাহিনী (নাট্য কবিতা ও গাথা কবিতা), কল্পনা (কবিতা), ক্ষণিকা (কবিতা), গল্পগুচ্ছ (১ম ও ২য় ভাগ—গল্প সংগ্রহ)

১৯০১—নৈবেদ্য (তত্ত্ব কবিতা), বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা (ভাষা তত্ত্ব)

১৯০৩—চোখের বালি (উপন্যাস), কর্ম্মফল (গল্প), কাব্যগ্রন্থ (১—৯ খণ্ড—মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত)

১৯০৪—ইংরাজী সোপান (পাঠ্য পুস্তক), স্বদেশী সমাজ (রাজনৈতিক পুস্তিকা), রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী—চিরকুমার সভা উপন্যাস আকারে এই খণ্ডে প্রথম সন্নিবিষ্ট), শিবাজী উৎসব (কবিতা)

১৯০৫—স্বদেশ (দেশাত্মবোধক কবিতা), বাউল (স্বদেশী গান), বিজয়া সম্মিলন (রাজনৈতিক পুস্তিকা)

১৯০৬—আত্ম শক্তি, ভারতবর্ষ, রাজভক্তি, দেশনায়ক (রাজনৈতিক পুস্তিকা), খেয়া (কবিতা), নৌকাডুবি (উপন্যাস)

১৯০৭—বিচিত্র প্রবন্ধ (প্রবন্ধ সংগ্রহ), চারিত্র পূজা (জীবনালোচনা), প্রাচীন সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), লোক সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), আধুনিক সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), হাস্য কৌতুক (হাস্য রসাত্মক নাটিকা), ব্যঙ্গ কৌতুক (হাস্য রসাত্মক নাটিকা)

১৯০৮—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ (চিরকুমার সভার উপন্যাস রূপ), সভাপতির অভিভাষণ (পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলন), প্রহসন (গোড়ায় গলদ ও বৈকুণ্ঠের খাতা একত্রে), রাজা-প্রজা, সমূহ, স্বদেশ (রাজনৈতিক পুস্তিকা), সমাজ (সামাজিক প্রবন্ধ), কথা ও কাহিনী (কবিতা), শারদোৎসব (নাটক), গান (গীত সংগ্রহ), শিক্ষা (শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা), মুকুট (শিশু নাট্য

১৯০৯—শব্দতত্ত্ব (ভাষা বিজ্ঞান), ধর্ম্ম (ধর্ম্মতত্ত্ব), শান্তিনিকেতন (১ম—৮ম ভাগ—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা), ইংরাজী পাঠ (১ম ভাগ- পাঠ্যপুস্তক), ছুটির পড়া (পাঠ্যপুস্তক), শিশু (কবিতা), চয়নিকা (কবিতা সঙ্কলন), প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)

১৯১০—রাজা (রূপকনাট্য), শান্তিনিকেতন (৯ম—১১শ ভাগ), গোরা (উপন্যাস), গীতলিপি (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), গীতাঞ্জলি (গান)

১৯১১—শান্তিনিকেতন (১২শ ভাগ), গীতলিপি (৪—৬ খণ্ড, গান ও স্বরলিপি)

১৯১২—ডাকঘর (রূপকনাট্য), ধর্ম্মশিক্ষা, ধর্ম্মের অধিকার (ধর্ম্মতত্ত্ব), শান্তিনিকেতন (১৩শ ভাগ), জীবন স্মৃতি (আত্মজীবনী), ছিন্নপত্র (চিঠি), অচলায়তন (রূপক নাট্য), আটটি গল্প, গল্প চারিটি (গল্পসংগ্রহ), পাঠ সঞ্চয় (পাঠ্য পুস্তক)

১৯১৪—উৎসর্গ (কবিতা), গীতিমাল্য (গান), গীতালি (গান)

১৯২৫—কাব্যগ্রন্থ (দশ খণ্ডে—কাব্য ও নাটক), গল্প সপ্তক (গল্প সংগ্রহ)

১৯১৬—চতুরঙ্গ (উপন্যাস), ফাল্গুনী (রূপক নাট্য), ঘরে, বাইরে (উপন্যাস), বলাকা (কবিতা), পরিচয় (প্রবন্ধ), সঞ্চয় (প্রবন্ধ)

১৯১৭—কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম (রাজনৈতিক নিবন্ধ), গান (গীত সংগ্রহ), ধর্ম্মসঙ্গীত (গীত সংগ্রহ), গীতলেখা (গান ও স্বরলিপি)

১৯১৮—গুরু (রূপক নাট্য—অচলায়তনের রূপান্তর), গীতলেখা (২য় ভাগ—গান ও স্বরলিপি), পলাতকা (কবিতা), গীতপঞ্চাশিকা (গান ও স্বরলিপি), অনুবাদ চর্চ্চা (পাঠ্য পুস্তক)

১৯১৯—বৈতালিক (গান ও স্বরলিপি), গীতি বীথিকা (গান ও স্বরলিপি), কেতকী (গান ও স্বরলিপি), জাপান যাত্রী (ভ্রমণ), শেফালি, কাব্য গীতি (গান ও স্বরলিপি)

১৯২০—অরূপরতন (রূপক নাট্য—'রাজা'র রূপান্তর), পয়লা নম্বর (ছোট গল্প সংগ্রহ)

১৯২১—ঋণশোধ (নাটক—'শারদোৎসবে'র রূপান্তর), শিশু ভোলানাথ (শিশুকাব্য), শিক্ষার মিলন, সত্যের আহ্বান (রাজনৈতিক নিবন্ধ)

১৯২২—মুক্তধারা (নাটক—'প্রায়শ্চিত্তে'র রূপান্তর), বর্ষামঙ্গল (গান), লিপিকা (গদ্য কবিতা)

১০২৩—বসন্ত (গীতিনাট্য), নব গীতিকা (গান ও স্বরলিপি)

১৯২৫—পূরবী (কবিতা), সঙ্কলন (প্রবন্ধ সংগ্রহ), গৃহপ্রবেশ (নাটক), প্রবাহিনী (গান), শেষ বর্ষণ (গান), দেশের কাজ (রাজনৈতিক পুস্তকা), গীত চর্চ্চা (গান সঙ্কলন)

১৯২৬—শোধবোধ (নাটক), রক্ত করবী (রূপক নাট্য), নটীর পূজা (নাটক), ঋতু উৎসব (শারদোৎসব, বসন্ত, শেষ বর্ষণ, ফাল্গুনী প্রভৃতি ঋতুনাট্য একত্রে), গীত মালিকা (১ম ভাগ—গান ও স্বরলিপি)

১৯২৭—লেখন (অটোগ্রাফ কবিতা—জার্ম্মানীতে মুদ্রিত), ঋতুরঙ্গ (গীতিনাট্য)

১৯২৮—শেষ রক্ষা (প্রহসন—'গোড়ায় গলদে'র রূপান্তর), পল্লী-প্রকৃতি (বক্তৃতা)

১৯২৯—সমবায় নীতি (বক্তৃতা), পরিত্রাণ (নাটক—'প্রায়শ্চিত্তে'র রূপান্তর), যাত্রী (ভ্রমণ কাহিনী), যোগাযোগ (উপন্যাস), শেষের কবিতা (উপন্যাস), তপতী (গদ্য নাটক- 'রাজা ও রাণী'র রূপান্তর), মহুয়া (কবিতা)

১৯৩০—গীত মালিকা (২য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), ভানুসিংহের পত্রাবলী (চিঠি)

১৯৩১—নবীন (গীতি নাট্য), পাঠ প্রচয় (২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ—পাঠ্য পুস্তক), সহজ পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ পাঠ্য পুস্তক), রাশিয়ার চিঠি (ভ্রমণ), গীত বিতান (১ম ও ২য় ভাগ—১১২৮টি গানের সঙ্কলন), বনবাণী (কবিতা), সঞ্চয়িতা (কবিতা সঙ্কলন), প্রতিভাষণ (৭০তম জয়ন্তী উৎসবের অভিভাষণ), শাপমোচন (গীতি নাট্য)

১৯৩২—গীতবিতান (৩য় খণ্ড—গান), পরিশেষ (কবিতা), কালের যাত্রা (নাটিকা), পুনশ্চ (গদ্য কবিতা)

১৯৩৩—দুইবোন (উপন্যাস), বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকীরণ, মানুষের ধর্ম্ম (বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা), চণ্ডালিকা (নাটিকা), তাসের দেশ (নাটিকা), বাঁশরী (নাটক), বিচিত্রা (সচিত্র কবিতা), ভারত পথিক রামমোহন (জীবনালোচনা)

১৯৩৪—মালঞ্চ (উপন্যাস), শ্রাবণ গাথা (বর্ষা সঙ্গীত), চার অধ্যায় (উপন্যাস)

১৯৩৫—শেষ সপ্তক (গদ্য কবিতা), বীথিকা (কবিতা), স্বরবিতান (১ম ভাগ—গান ও স্বরলিপি)

১৯৩৬—শিক্ষা স্বাঙ্গীকরণ (বক্তৃতা), চিত্রাঙ্গদা (নৃত্যনাট্য), পঞ্চভূত (সংশোধিত সংস্করণ), প্রাক্তনী (বক্তৃতা), পত্রপুট (গদ্য কবিতা), ছন্দ (ছন্দতত্ত্ব), শ্যামলী (গদ্য কবিতা), সাহিত্যের পথে (প্রবন্ধ), পাশ্চাত্য ভ্রমণ (ইউরোপ প্রবাসীর পত্র ও ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরির সংশোধিত সংস্করণ), বিচিত্র প্রবন্ধ (সংশোধিত সংস্করণ), স্বরবিতান (২য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), বাংলা শব্দতত্ত্ব (সংশোধিত সংস্করণ)

১৯৩৭—খাপছাড়া (হাসির ছড়া), সে (ছোটদের গল্প), জাপানে ও পারস্যে (ভ্রমণ), কালান্তর (সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ), বিশ্বপরিচয় (বিজ্ঞান), ছড়ার ছবি (ছেলেদের কবিতা), প্রান্তিক (কবিতা)

১৯৩৮—স্বরবিতান (৩য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), পথে ও পথের প্রান্তে (চিঠি), সেঁজুতি (কবিতা), বাংলা ভাষা পরিচয় (ভাষাতত্ত্ব), প্রহাসিনী (রঙ্গ কবিতা), সমাজ (সংশোধিত সংস্করণ), গীতবিতান (১ম খণ্ড—নূতন সংস্করণ)

১৯৩৯—গীত বিতান (২য় ভাগ—নূতন সংস্করণ) , চণ্ডালিকা

(নৃত্যনাট্য), আকাশ প্রদীপ (কবিতা), শ্যামা (নৃত্যনাট্য), পথের সঞ্চয় (চিঠি), বাংলা কাব্য পরিচয় (বাংলা কবিতার সঙ্কলন)

১৯৪০—স্বরবিতান (৪র্থ ভাগ—গান ও স্বরলিপি), নব জাতক (কবিতা), সানাই (কবিতা), চিত্রলিপি (ছবি সংগ্রহ), ছেলেবেলা (বাল্য কাহিনী), তিন সঙ্গী (গল্প সংগ্রহ)

১৯৪১—আরোগ্য (কবিতা), জন্মদিনে (কবিতা), গল্পসল্প (ছোটগল্প ও ছড়া), সভ্যতার সঙ্কট (রাজনৈতিক বক্তৃতা)

সম্প্রতি বিশ্বভারতী সময়ানুক্রমে সাজিয়ে কবির সমুদয় গ্রন্থাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করছেন। এই 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র আনুষঙ্গিক রূপেই বেরিয়েছে কবির বাল্য রচনা সমূহেরও একটি সংগ্রহ—তার নাম 'অচলিত সংগ্রহ'।

ওপরে যে তালিকা দেওয়া হল, তা থেকে কতকগুলি সাময়িক পুস্তিকার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, আর ঐ তালিকায় বই-এর প্রকাশ কালকেই অনুসরণ করা হয়েছে। কোন-কোন আগেকার লেখা বই সেই জন্যে পরে বসেছে।

গান ও স্বরলিপির ক্ষেত্রে গানগুলিই কবির রচিত—স্বরলিপি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরী, এ ছাড়া অন্যেরও আছে।

ইংরাজী বইয়ের তালিকা

1912—Gitanjali (গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু, চৈতালী, স্মরণ প্রভৃতি বইয়ের নির্ব্বাচিত কবিতার কবি-কৃত গদ্যানুবাদ)

1913—Gardener (বিবিধ কবিতার অনুবাদ), Crescent Moon (শিশু কবিতার অনুবাদ), Chitra (চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ)

1914—The King of the Dark Chamber (রাজার অনুবাদ—অনুবাদক K. C. Sen), Post Office (ডাকঘরের অনুবাদ—অনুবাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়), Sadhana (হার্ভার্ড বিশ্ববিত্থালয় বক্তৃতা), Poems of Kabir (কবীরের দোঁহার অনুবাদ—Underhill-এর সহযোগিতায় কৃত)

1915—Maharani of Arakan (ডালিয়া গল্পের অনুভাবে কবি কর্তৃক লিখিত)

1916—Fruit-gathering (বিভিন্ন বই-এর কবিতার অনুবাদ), Hungry Stones and other Stories (ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি গল্পের অনুবাদ), Stray Birds (কণিকার অনুবাদ)

1917—My Reminiscences (জীবনস্মৃতির অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর), Sacrifice and other Plays (বিসর্জ্জন প্রভৃতি নাটকের অনুবাদ), Cycle of Spring (ফাল্গুনীর অনুবাদ), Personality (আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা), Nationalism (জাপান এবং আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

1918—Lover's Gift and Crossing (বিভিন্ন বইয়ের কবিতার অনুবাদ), Mashi and other Stories কঙ্কাল, শুভদৃষ্টি প্রভৃতি গল্পের অনুবাদ), Stories From Tagore (গল্প সঙ্কলন), Parrot's Training (ব্যঙ্গ রচনা)

1919—Centre of Indian Culture (বক্তৃতা), The Home and the World ঘরে বাইরের অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

1921—Greater India (রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর), The Wreck (নৌকাডুবির অনুবাদ), The Fugitive (মানসী, সোনার তরী, কথা ও কাহিনী, পলাতকা প্রভৃতির নির্ব্বাচিত কবিতার অনুবাদ), Poems from Tagore (কবিতা সঙ্কলন) Glimpses of Bengal (ছিন্নপত্রের অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

1922—Thought-Relies, Creative Unity (বক্তৃতা)

1924—Gora (গোরার অনুবাদ—অনুবাদক W. Pearson)

1925—Red Oleanders (রক্তকরবীর অনুবাদ), Broken Ties and other Stories (চতুরঙ্গ এবং আরো কয়েকটি গল্পের অনুবাদ)

1931—The Child (মূল ইংরাজী কবিতা), Religion of Man (অক্সফোর্ডে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতা)

1937—Collected Poems and Plays (সমস্ত ইংরেজী কবিতা ও নাটকের সংগ্রহ)